Registered

মূল্য ঃ পাঁচ টাকা

এক

শ্রমজীবী জনসমষ্টির স্বদেশ বলে কোন বস্তুই নেই, যা তাদের আদপেই নেই তা থেকে আমরা তাদের বঞ্চিত করতে পারি না। যেহেতু সর্বহারাদের সর্বাগ্রে রাজনৈতিক আধিপত্য অর্জন করতে হবে, জাতির অগ্রচারী শ্রেণী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে, নিজেদের আত্মপ্রকাশ করতে হবে একক জাতিরূপে, সে অর্থে তাদের চারিত্রবৈশিষ্ট্যই জাতীয়—

—কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো

গণবার্তা

সূচি..... পৃষ্ঠা

সম্পাদকীয় ১

ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধি... বিক্ষোভ অবস্থান ১

দেশে-বিদেশে ২

মার্কসীয় দর্শন...ডিক্টেটরশিপ ৩

ছাত্র-যুব আন্দোলনে পুলিশী হামলা ৪

সতজিতের ছবি....মূল্যবোধের সীমা ৫

ত্রিপুরায় রাজ্য যুব কনভেনশন ৬

১৪-১৫ মে নিখিল বঙ্গ মহিলা সংঘের রাজ্য কাউন্সিল ৭

পানিহাটিতে আরএসপি.... কর্মসূচি ৮

68th Year 52th Issue ★ Kolkata ★ Weekly GANAVARTA ★ Saturday 28th May & 4th June 2022 [Joint Issue]

সম্পাদকীয়

কাশ্মীরের মানুষের দুর্দশার শেষ নেই

২০১৯-এর আগস্টের পর, অর্থাৎ কাশ্মীর উপত্যকা থেকে ৩৭০ আর ৩৫এ ধারা বাতিলের পর কেটে গেছে প্রায় তিনটি বছর। কত উন্নয়ন, সন্ত্রাস থেকে মুক্তি, বেকারত্বের অবসানের গল্প শুনিয়ে কার্যত রাষ্ট্রিক অবরোধের মধ্যে উপত্যকার মানুষকে বসবাস করতে বাধ্য করা হয়েছে। অতিমারিতে চালু হওয়া রাষ্ট্রিক লকডাউনের প্রাথমিক পরীক্ষাগার হয়েছিল সমগ্র উপত্যকা। সিডিশন আইনের খাঁড়া ঝুলিয়ে স্তব্ধ করে রাখা হয়েছিল প্রতিটি বিরোধী রাজনৈতিক দল ও সমাজ কর্মীদের। সংবাদপত্র ও প্রচারমাধ্যম সহ ইন্টারনেটের ওপর চেপে বসে আছে এখনো জরুরি অবস্থার বিধিনিষেধের বেড়া। ওদিকে শান্তি স্থাপিত হয়েছে এবং উগ্র মৌলবাদী কার্যকলাপ বন্ধ হয়েছে বলে দিল্লির শাসকদের হুকুমত চালু রাখতে নিজেদের ঢাক নিজেরাই বাজিয়ে ছিল প্রশাসন ও পুলিশ ও সামরিক বাহিনী। আজ একের পর এক সন্ত্রাসী হামলায় কাশ্মীরী পন্ডিত সহ হিন্দু এবং শিখ সরকারি কর্মচারী, ব্যাঙ্ক কর্মচারী, পরিযায়ী শ্রমিকদের অসহায়ভাবে খুন হতে থাকার পর পুলিশ প্রশাসনের আর মুখ লুকিয়ে রাখার জায়গা নেই। এতদিন সংখ্যালঘু নাগরিক সমাজ স্যান্ডউইচের মতো হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন এবং সন্ত্রাসবাদী, উভয়ের অত্যাচারে নিষ্পেষিত হয়েছে।

মুসলমান সাংবাদিকদের রক্তে রাজপথ ভিজেছে সন্ত্রাসবাদীদের বন্দুকের গুলিতে। প্রতিটি হিংসোত্মক কার্যকলাপ শুধুমাত্র প্রশাসনের ব্যর্থতারই সাক্ষ্য দেয় না। কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা লুণ্ঠন করার গর্বে স্ফীত হিন্দুত্ববাদের ধ্বজাধারী রাষ্ট্র যেভাবে সাম্প্রদায়িক হিংসার বিষ সমাজে ছড়িয়ে দিচ্ছে তাতে শুধু সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা বিশ্বাস এবং সম্প্রীতি ধ্বংস করা হচ্ছে না। সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের ন্যায্যতা খুঁজে পাচ্ছে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী সমূহ।

এসব সত্ত্বেও সামরিক বাহিনীর পদস্থ কর্তারা বলছেন, এদেশের যুবকরা সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের সঙ্গে আর জড়িত নয়। যা হচ্ছে তার জন্য দায়ী পাকিস্তানী অনুপ্রবেশকারী সন্ত্রাসী গোষ্ঠীসমূহ। অর্থাৎ প্রশাসন এক অর্থে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে, তারা এত কিছু করেও সীমান্তে অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে পারেনি। কাশ্মীরী পণ্ডিত, সরকারি, ব্যাঙ্ক এবং স্কুল কলেজের কর্মী শুধু নয় রাজ্যের নিরাপত্তা কর্মী সহ একজন নাগরিকেরও নিরাপত্তা দিতে বর্থ সরকার। কোটি কোটি টাকা খরচ করে গড়ে তিনজনের পিছনে একজন পুলিশ আধাসামরিক নিরাপত্তা কর্মী বহাল রেখে। কাশ্মীরী পণ্ডিত সহ হিন্দু ও শিখ সমাজ সামগ্রিক স্তরে সরব হচ্ছেন সরকারের নীতির বিরুদ্ধে। এমনকি তাঁরা প্রকাশ্যেই বলছেন, রাষ্ট্রের অনুপ্রেরণাই অর্ধ সত্য তথা মিথ্যা তথ্য দিয়ে নির্মিত কাশ্মীরী ফাইলস সিনেমা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে ইন্ধন জোগাচ্ছে। এভাবেই ভারত সরকার যুগপৎ রাষ্ট্রিক সন্ত্রাস এবং মৌলবাদী সন্ত্রাস টিকিয়ে রাখছে জীবন জীবিকার সমস্যাকে আড়াল করতে।

কাশ্মীরী হিন্দু ও শিখ সমাজের নাগরিকরা, যাঁরা ১৯৯১ সালের হামলার পরেও ভিটের মায়া কাটাতে না পেরে জন্মভূমি ত্যাগ করেননি তাঁদের অবস্থা ভীষণ শোচনীয়। ক্রমে ক্রমে সাজানো ঘরবাড়ি বাগান ছেড়ে জরাজীর্ণ বস্তিতে ঘেঁষাঘেঁষি করে বাস করছেন ভয়ে ভয়ে। সরকার নিরুত্তর। ৩৭০ উঠে যাবার পর মোদীর আশ্বাস বাণীতে ভরসা করে বদলির অধিকার ত্যাগ করে বিশেষ প্যাকেজে যে হিন্দু ও শিখরা চাকরিতে যোগ দিয়েছেন, তারা অপদার্থ সরকারের বিশ্বাসভঙ্গে এতটাই বিরক্ত যে বিক্ষোভে নামতে বাধ্য হয়েছেন। সমস্ত বিষয়টাই বুমেরাং হয়েছে বিজেপি সরকারের কাছে। অবশেষে বাধ্য হয়েই, হয়তো আরো এক দফা মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে, কেন্দ্রের নির্দেশে কিছু সাময়িক সমাধানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন। শুধুমাত্র সরকারি কর্মচারীদের নাকি আগামী ৬ জুনের মধ্যেই নিরাপদ জায়গায় বদলি করা হবে। কার্যত উপত্যকায় কোন জায়গাটি যে নিরাপদ সেই বিষয়ে নিদারুণ আশঙ্কায় রয়েছেন কর্মীদের প্রত্যেকে। আর যাঁরা সরকারি চাকরি করেন না তাঁদের কি হবে? কোনো উত্তর নেই প্রশাসনের কাছে।

সর্বজনীন উন্নয়ন, কৃষিভিত্তিক শিল্প এবং সন্ত্রাসমুক্ত উপত্যকার স্বপ্ন বিক্রির ফেরিওয়ালা মোদীর সরকার আজ নীরব। একদিকে হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্র, অপরদিকে আদানী, আম্বানী, টাটা প্রভৃতি সহ দেশিবিদেশি কর্পোরেট জগতের লুঠের জমি তৈরি করা এই সরকারের একমাত্র লক্ষ্য। না হলে সারা পৃথিবীর মানুষ কাশ্মীরের মানুষের অবরুদ্ধ জীবনযাত্রা ও গণতন্ত্রহীন সমাজের পরিস্থিতি জানা সত্ত্বেও এখনো পর্যন্ত উপত্যকার মূলধারার রাজনৈতিক দলসমূহ যথা ন্যাশনাল কনফারেন্স, কংগ্রেস, পিডিপি সহ বামদলগুলির সঙ্গে গণতান্ত্রিক আবহে বার্তালাপের পথ কেন বর্জন করেছে বিজেপি এবং স্থানীয় প্রশাসন। না হলে অচিরেই যে আবার অগ্নিগর্ভ কাশ্মীর গণআন্দোলনে বিস্ফারিত হবে। কাশ্মীর ফাইল আর সরকারি বিভেদ পন্থার নীতি অচল হয়ে যাবে ক্ষমতার নেশায় অন্ধ মোদী সরকার তা বুঝেও বুঝতে পারছে না। এটাই ট্র্যাজেডি।

৩১ মে দুপুর ৩টা থেকে সাড়ে ৬টা পর্যন্ত

ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধি ও বেকারত্বের অবসানের দাবিতে কলকাতায় ১৫টি বামপন্থী দলের বিক্ষোভ অবস্থান

কেন্দ্রীয় স্তরে পাঁচটি বামপন্থী দল যথা, সি পি আই (এম), সি পি আই, ফরোয়ার্ড ব্লক, সি পি আই (এম এল) লিবারেশন এবং আর এস পি'র শীর্ষ নেতৃত্ব জ্বালানি তেল, কেরোসিন, রান্নার গ্যাস সহ সমস্ত জিনিসের লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে এবং দেশের বেকারত্বের অবসানে ২৫ মে থেকে ৩১ মে পর্যন্ত দেশজুড়ে প্রতিবাদী আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

এই আহ্বানে অভূতপূর্ব সারা মিলেছে। দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, মুম্বাই, হায়দ্রাবাদ, চেন্নাই, থিরুবনন্তপুরম, বেঙ্গালুরু, পাটনা, গৌহাটি, জয়পুর, বিজয়ওয়াড়া ইত্যাদি সবকটি শহরেই বামপন্থী দলগুলির নেতৃত্বে মানুষ পথে নেমে প্রতিবাদে সামিল হন। নানা রাজ্যে গ্রাম্যগ্রামান্তরেও এই আন্দোলনের রেশ পড়েছে। অনেক স্থানেই লক্ষ করা গেছে যে, বর্তমান অসহনীয় অবস্থায় উদ্বিগ্ন মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে পথে নেমে এসেছেন। নতুনভাবে তীব্র অর্থনৈতিক সংকটে জর্জরিত দরিদ্র অংশের মানুষদের সামনে আর কোনও পথ খোলা নেই। আন্দোলনই একমাত্র পথ।

পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য বামফ্রন্টের নেতৃত্বে ১৫টি বামপন্থী ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক দলগুলি সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বামপন্থীদের ঘোষিত কর্মসূচি সফল করতে পথে নেমেছিল। রাজ্যের সবকটি জেলা সদরে, মহকুমা এমনকি ব্লকগুলিতে প্রতিবাদী মানুষের নিবিড় প্রচার আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে। সবকটি জেলাতেই সাধারণ মানুষের উৎসাহী অংশগ্রহণ ছিল। সপ্তাহব্যাপী প্রচার আন্দোলনের শেষদিন অর্থাৎ কলকাতার রানি রাসমনি মোড়ে বড় সমাবেশ ও অবস্থান বিক্ষোভ সংগঠিত হয়। মূলত কলকাতা জেলা, হাওড়া, দুই ২৪ পরগনা, হুগলী এবং নদীয়া জেলার একাংশ থেকে বামপন্থী কর্মী নেতারা কলকাতার কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। বেলা ৩টা থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত সাড়ে তিনঘণ্টাব্যাপী অবস্থান বিক্ষোভ ও প্রতিবাদী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

কলকাতার কেন্দ্রীয় সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন রাজ্য বামফ্রন্টের সভাপতি কমরেড বিমান বসু। তিনি এই কর্মসূচির উদ্দেশ্যগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করেন। সমস্ত জিনিসপত্রের অভূতপূর্ব মূল্যবৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করেও তিনি উল্লেখ করেন যে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের যে দায়িত্ব পালন করা উচিৎ তা আদৌ পালিত হচ্ছে না। পাশাপাশি রাজ্য প্রশাসনের বিভিন্ন মন্ত্রকে যে লাগামহীন দুর্নীতি চলছে তার উল্লেখ করে তিনি বলেন যে বেশ কিছুকাল ধরেই রাজ্যে চরম অরাজক অবস্থা বিরাজ করছে। এই অপব্যবস্থার পরিবর্তনে আরও ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

সভায় বামপন্থী নেতৃত্বের মধ্যে সর্বপ্রথম বক্তব্য রাখেন আর এস পি'র পক্ষে কম. মনোজ ভট্টাচার্য। তিনি পেট্রোল, ডিজেল এবং রান্নার গ্যাসের অসহনীয় মূল্যবৃদ্ধির প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলেন যে, মোদী সরকারের অপশাসনকালে দেশের সমস্ত সম্পদের ওপর কর্তৃত্ব করছে অতি অল্পসংখ্যক কর্পোরেট কোম্পানি। সরকারের সমস্ত নীতিই প্রণীত হচ্ছে নির্দিষ্টভাবে এই সব কর্পোরেটদের প্রভূত মুনাফা অর্জনের স্বার্থেই। সর্বাপেক্ষা যন্ত্রণার বিষয়, দেশের দরিদ্র জনসংখ্যার জ্বালানি বলতে বোঝায় কেরোসিন তেল। তার দাম ইদানিংকালে রেশন মারফৎ ৭৩ টাকা প্রতি লিটার। তাও ঠিকমতো দেওয়া হয় না। খোলাবাজারে অসাধু ব্যবসায়ীরা কমপক্ষে ৮৫ টাকা নিচ্ছে প্রতি লিটারে। চরম নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়ে চলেছে। রাজ্য সরকার নীরব দর্শক।

কম. ভট্টাচার্য আরও বলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারের কর্পোরেটে তোষণকারী সিদ্ধান্তগুলির ফলে বিগত ২০২০ ও ২০২১ সালে যখন করোনা অতিমারির প্রকোপে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতিদিন অসহায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছেন, সেই সময়ে ভারতে অর্বুদপতি বা বিনিয়োনিয়ারের সংখ্যা প্রভূত বেড়ে গেছে। বিশেষ করে, মোদীর অতি ঘনিষ্ঠ দুই ব্যবসায়ী আদানি-আম্বানী প্রভৃতি লাগাতার লুণ্ঠনে ব্যস্ত ছিল। এর সঙ্গেই দেশের সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে বিপথে পরিচালিত করতে মোদীর দল মন্দির মসজিদ প্রসঙ্গগুলি বিশেষভাবে সামনে নিয়ে আসছে। অতি গভীর চক্রান্তমূলক প্রক্রিয়ায় দেশের সর্বমোট জনসংখ্যাকে ধর্মের নামে বিভাজিত করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা সংগঠিত করার লাগাতার অপপ্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

মোদীর সহায় আর এস এস-এর মতো এক হিংস্র ফ্যাসিবাদী সংগঠন, এই সংগঠনের নানা শাখাপ্রশাখার মাধ্যমে সাধারণ জনমানসে বিষ ছড়ানো হচ্ছে। রাজ্যের কাছে লজ্জার বিষয় যে, সেই চক্রান্তকারীদের মূল নেতা মোহন ভাগবৎ যখন রাজ্যে আসেন, তখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে সাগ্রহ অভ্যর্থনা জানান।

যাঁরা প্রতিবাদ করছেন অথবা যাঁরা সাম্প্রদায়িক হানাহানির বিরুদ্ধে জনমত নির্মাণের প্রয়াস নিচ্ছেন তাঁদের দেশদ্রোহী বলে চিহ্নিত করে জেলে আটক করে রাখা হচ্ছে। ইউ এ পি এ'র মতো দানবীয় আইন যেমন তেমনভাবে ব্যবহার করে বহু সমাজকর্মীকে অনির্দিষ্টকালের জন্য কারান্তরালে বন্দি করা হচ্ছে। এমন দুর্বিষহ সময় স্বাধীন ভারতে কখনোই আর দেখা যায় নি।

কম. মনোজ ভট্টাচার্য আরও বলেন যে, ভারতে কর্মহীন মানুষের সংখ্যা বিপুল বেগে বৃদ্ধি পেয়েছে। নতুন কর্মসংস্থান আদৌ হচ্ছে না। উপরন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের নানা মন্ত্রকে ধারাবাহিকভাবে ছাঁটাই-এর খড়্গ নেমে আসছে চাকুরিরত মানুষদের বিরুদ্ধে। শুধুমাত্র রেলমন্ত্রকেই বিগত কয়েক মাসে ৭২০০০ শ্রমিক কর্মচারীকে ছাঁটাই করা হয়েছে। কর্পোরেট কোম্পানিগুলির কাছে জলের দরে রাষ্ট্রীয় সম্পদ বিক্রি করার প্রয়োজনে কর্মীসংখ্যা দ্রুত কমিয়ে ফেলা হচ্ছে। মোদী সরকার একান্তভাবেই সাধারণ জনজীবনকে বিধ্বস্ত করে চলেছে। এই অবস্থার

এর পর ৪-এর পাতায়

চিনের ডায়নামিক জিরো কোভিড নীতি

এক বারই যথেষ্ট নয়, বার বার কোভিড পরীক্ষা করতে হবে, দরকারে ৪৮ ঘণ্টা পর পর। টাটকা কোভিড রিপোর্ট পকেটে নিয়েই বাড়ি থেকে বেরোতে হবে। যে কোনো জায়গায় যে কোনো মানুষকেই কোভিড সন্দেহে আটকে দেওয়া চলবে। কোনো ওজর আপত্তি হলেই কড়া শাস্তি—এগুলি কর্তৃপক্ষের অধিকার। এই হল 'ডায়নামিক জিরো কোভিড' নীতি। চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিন পিং বলেছেন এই নীতিকে কোনো প্রশ্ন করা চলবে না।

আঘাত করলে ভারত কাউকে রেয়াত করবে না

নয়াদিল্লী, ৭ মে—প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং-এর একমাস ধরে বিভিন্ন মঞ্চে চিনকে কড়া বার্তা দিতে শোনা যাচ্ছে। সম্প্রতি বলেছেন, 'কেউ আঘাত করলে ভারত কাউকে রেয়াত করবে না।" এখানে 'কেউ' মানে যে চিন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। পূর্ব লাদাখে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখার পেছনে চিন সেনাদের সরে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই বলে সীমান্ত এলাকায় দ্রুত পরিকাঠামো মজবুত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশনকে। চিন যেভাবে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখার ওপারে পরিকাঠামো বৃদ্ধির কাজ ইতিমধ্যেই শেষ করেছে, তাতে আমাদের প্রতিরক্ষামন্ত্রী বেশ উদ্বিগ্ন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেছেন, সীমান্ত এলাকার উন্নয়নও প্রতিরক্ষা কৌশলের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। আমাদের সুরক্ষার জন্য যারা কাজ করছেন, আমাদের অগ্রাধিকার, তাদের সব রকম সুযোগ সুবিধার বন্দোবস্ত করতে হবে।

ভারতীয় জনতা পার্টির দাবি ছিল : নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় এলে কেন্দ্র 'বলশালী' নীতি নিয়েই চলবে

কিন্তু বাস্তব তো অন্য কথাই বলছে। মনমোহন সিংকে বিজেপি 'দুর্বল প্রধানমন্ত্রী' আখ্যা দিয়েছিল। অটল বিহারী বাজপেয়ীকেও নরম, আপসপন্থী প্রধানমন্ত্রী বলা হয়েছিল। ঘরের মাঠে লম্বা চওড়া দাবি করা বেশ সহজ, কিন্তু দেশের বাইরে গিয়ে অর্থনীতি ও ভূকৌশলগত চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করাটা অন্য বিষয়। সম্প্রতি ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রনেতাদের সঙ্গে ভারতীয় নেতাদের দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের সেই 'বলশালী' নীতির হদিস মেলে নি। ভারতে অপরাধ করে পালিয়ে যাওয়া বিজয় মাল্য, নীরব মোদী, পুরুলিয়ায় অস্ত্র বর্ষণের সঙ্গে যুক্ত কিম ডেভি, ভারতীয় জলপথে দুই ধীবরকে গুলি করে হত্যা করার জন্য দায়ী মেরিনদের ফিরিয়ে আনা নিয়ে কার্যকর কোনও সিদ্ধান্ত ওই সব বৈঠকের পর দেখা যায়নি। আসল কথা, বাণিজ্যিক স্বার্থ এবং কৌশলগত কারণে এই দেশগুলির উপর ভারতের নির্ভরতা এতটাই যে, 'বলশালী বিদেশনীতি'র বাস্তবায়ন সহজসাধ্য ব্যপার নয় আদৌ।

ইতালি থেকে দুই মেরিনকে ফিরিয়ে আনার দাবি ইতালি সরকার সরাসরি অগ্রাহ্য করেছে। সম্প্রতি ইতালি ও ভারতের বিদেশমন্ত্রীদের মধ্যে বৈঠকে, এই প্রসঙ্গে ভারতের বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্করকে কোনও উচ্চবাচ্য করতে শোনা যায়নি।

ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনের সাম্প্রতিক ভারত সফরের সময় নীরব মোদী ও বিজয় মাল্যের পালিয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গ উঠলেও তাঁদের ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে আগের মতই শুকনো আশ্বাস ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায়নি।

মে মাসের গোড়ায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ত্রিদেশীয় ইউরোপ সফরে ডেনমার্কে গিয়েছিলেন। এই সফরটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু পুরুলিয়া অস্ত্র মামলার মূল অভিযুক্ত ডেনমার্কের কিম ডেভিকে ভারতে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে কোনো কথা বলার মতো সুযোগই করতে পারেননি নরেন্দ্র মোদী।

মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারের জন্য অবশ্যই হাজার কোটি টাকা!

এই দাবি বিজেপি নেতার। কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী বদলের জল্পনার সময় রাজ্য বিজেপি'র এক নেতার মন্তব্য আড়াই হাজার কোটি টাকার বিনিময়ে মুখ্যমন্ত্রীত্বের সুযোগ এসেছিল বলে দাবি করেছেন। বিজেপি নেতাটির নাম বসনগৌড়া পাতিল ইয়াতনল। আড়াই হাজার কোটি টাকা দিলেই কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রীর পদ মিলবে বলে তাকে প্রস্তাব দিয়েছিল দিল্লীর বেশ কয়েকজন। স্বভাবত রাজ্য বিজেপি বেশ অস্বস্তিতেই। রাজ্যে বিরোধী কংগ্রেস বিষয়টি নিয়ে তদন্তের দাবিতে সরব হলেও, মুখ্যমন্ত্রী বাসবরাজ বোম্মাই এই নিয়ে কোনো মন্তব্য করেননি।

প্রসঙ্গত, গত বিধানসভা নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা না মিললেও ঘোড়া কেনাবেচা করে কর্নাটকে সরকার গড়েছিল বিজেপি। একাধিক অভিযোগের পর সেই সরকারের মুখ্যমন্ত্রী ইয়েদুরাবাপ্পাকে সরিয়ে বোম্মাইকে মুখ্যমন্ত্রী করা হলেও, বোম্মাই এখন খুব সুবিধাজনক অবস্থায় নেই, দলের অনেকেই তাঁর বিরুদ্ধে সরব শোনা যাচ্ছে, আগামী বছর কর্নাটকের বিধানসভা নির্বাচনের আগে বোম্মাইকে সরে যেতে হতে পারে।

সুতরাং আড়াই হাজার কোটি টাকায় মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সির গুজব সত্যি হোক বা মিথ্যা হোক, এই প্রকার গুজবের জমি কর্নাটক সহ একাধিক রাজ্যেরই জমি খুবই উর্বর।

পাগলের প্রলাপ

পাগলের প্রলাপ বলে উড়িয়ে দিলে চলবে না, আপাতদৃষ্টিতে পাগলের প্রলাপ মনে হলেও এর মধ্যেই এক নির্দিষ্ট Agenda বা কর্মসূচি আছে। যাকে বলে Method in Madness —কাশী মথুরার পর এবার হিন্দুত্ববাদীদের দাবির কেন্দ্র শাহজাহানের তৈরি তাজমহলও।

উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা বহু বছর ধরেই তাজমহলকে 'তেজো মহালয়' নামে একটি মন্দির বলে দাবি করে থাকে। বারাণসীর বিশ্বনাথ মন্দির লাগায়ো জ্ঞানব্যপী মসজিদ ও মথুরায় শাহি মসজিদ নিয়ে আদালতে যে মামলা চলছে তার পরিপ্রেক্ষিতে তাজমহল কোনো দিন 'তেজো মহালয়' নামে মন্দির ছিল কিনা তা খতিয়ে দেখতে একটি তথ্য অনুসন্ধানী দল গড়ার আর্জি নিয়ে ইলাহাবাদ হাইকোর্টের লখনউ বেঞ্চে আবেদন করেছে বিজেপি। বিজেপি'র মিডিয়া ইন চার্জ বলে দাবি করা রজনীশ সিংহ নামে এক ব্যক্তি ওই আবেদনে তাজমহলের বন্ধ থাকা ঘরগুলি খুলে বা খতিয়ে দেখার আর্জিও জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ ধ্বংস করার সময়েই উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা ঘোষণা করেছিল 'ইয়ো তো ঝ্রেফ ঝাঁকি হ্যায় : কাশি মথুরা বাকি হ্যায়'। নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতাসীন হওয়ার পর উগ্র হিন্দুত্ববাদী কাশী, মথুরার ধর্মস্থানে মসজিদ সরানোর দাবি তুলে সক্রিয়ভাবে আসরে নামে।

হিন্দুত্ববাদীদের দাবির তালিকায় এবার জুড়ে গেল ইসলামি স্থাপত্যের অন্যতম সৌধ তাজমহলও।

১৯৯১ সালের ধর্মসংক্রান্ত আইনে বলা হয়েছে ১৯৪৭ সালে ১৫ আগস্টে ভারতের স্বাধীনতার দিন যেখানে যে ধর্মস্থান রয়েছে, সেখানে তা থাকবে। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের এক বছর আগে তৈরি সেই আইন অনুযায়ী কাশী ও মথুরা মন্দিরের লাগোয়া মসজিদ সরানোর দাবিও অনৈতিক।

বিভিন্ন সঙ্কটে জর্জরিত বর্তমান শাসন ব্যবস্থায় দৈনন্দিন জীবনের সমস্যাকে আড়াল করতেই ধর্মীয় উত্তেজনাকে অস্ত্র করে বিভাজনের রাজনীতি করেছে ক্ষমতাসীন বিজেপি।

তাই তাজমহল নিয়েও হিন্দুত্ববাদীরা এমন উদ্ভট দাবি করছে।

নরেন্দ্র মোদীর সরকার রাষ্ট্রদ্রোহ আইনের পক্ষেই

ঔপনিবেশিক আমলে মূলত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পায়ে বেড়ি পরানোর জন্য যে আইনের সূচনা হয়েছিল দেশ স্বাধীন (!) হওয়ার ৭৫ বছর পরেও সে আইনের পক্ষেই জোর সওয়াল করল বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার। মজার ব্যাপার সরকার পক্ষের যুক্তি যেহেতু পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চ ১৯৬২ সালে দেশদ্রোহ আইনের পক্ষে স্বীকৃতি দিয়েছিল, এই আইনের অপব্যবহার যতই হোক না, বর্তমানে কম সংখ্যার (তিন) বিচারপতিদের নিয়ে গঠিত বেঞ্চ এই কুখ্যাত দেশদ্রোহ আইনের পুর্নবিবেচনা করতে পারে না। সরকার পক্ষের আরও যুক্তি, সাংবিধানিক বেঞ্চের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত আইনের অপব্যবহার রুখতে হলে প্রতিটি অপব্যবহারের অভিযোগকে আলাদা আলাদা ভাবে বিচার করতে হবে। অর্থাৎ, এই আইনের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে ন্যায় বিচারের জন্য অভিযুক্তকে বর্তমান বিচার ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে অনন্তকালও অপেক্ষা করতে হতে পারে। অতএব Justice deleyed is justice denied হতে পারে কেন্দ্রের যুক্তি স্বীকৃতি পেলে। সম্প্রতি প্রধান বিচারপতি এন ভি রমনার নেতৃত্বে গঠিত তিন বিচারপতির বেঞ্চে প্রশ্ন উঠেছিল, পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চ এই আইন স্বীকৃতি দিয়েছিল বলে বর্তমান বেঞ্চ ঐ রায়গুলি বিবেচনার জন্য বৃহত্তর বেঞ্চেও পাঠাতে পারে কিনা।

সুতরাং মানবিকতার প্রশ্ন নয়, নৈতিকতার প্রশ্ন না, গণতান্ত্রিক রীতিনীতির প্রশ্ন না; কেন্দ্রের সাফ জবাব পাঁচ বিচারপতি নিয়ে গঠিত বেঞ্চের রায় কম সংখ্যার বিচারপতিদের বেঞ্চের উপরও প্রযোজ্য। কুযুক্তির মূল ভিত্তি হল সংখ্যা পাঁচ জিতবে তিনের উপর। পরবর্তী শুনানিতে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত হতে পারে, আইনজীবিরা মনে করছেন কেন্দ্র কার্যত সময় সাপেক্ষ আরও বৃহত্তর বেঞ্চে এই মামলা পাঠঅনোর পক্ষে সওয়ার করে গোটা প্রক্রিয়া পিছিয়ে দেওয়া কৌশল নিয়েছে।

অতএব রাষ্ট্রদ্রোহ আইনের নজরদারি থেকে বাঁচতে হলে, সমঝে চলতে হবে। আপাত আমাদের চোখ বন্ধ রাখতে, কান বন্ধ রাখতে হবে, মুখ বন্ধ রাখতে হবে।

দেশব্যাপী বিদ্যুৎ সঙ্কট

কোভিড পরবর্তী অসংখ্য সমস্যা জর্জরিত ভারতে দেশব্যাপী বিদ্যুৎ সঙ্কট পরিস্থিতি সঙ্গীন হয়ে উঠেছে। কোভিডের পর বিদ্যুতের চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে কয়লার জোগান প্রায় তলানিতে। কয়লার অভাবে অন্তত ১২ রাজ্যে দৈনিক ২ থেকে ১২ ঘণ্টা লোডশেডিং চলছে। কোভিডের পর শিল্পে ঘুরে দাঁড়ানোর সময়ে বিদ্যুতের অতিরিক্ত চাহিদা আকস্মিক নয়। এই চাহিদার ৭০ শতাংশই আসে কয়লা নির্ভর তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি থেকে।

পরিস্থিতি এতটাই সঙ্গীন, যাত্রীবাহী ট্রেন বাতিল করে কয়লাবাহী মালগাড়ীর সাহায্যে অতিরিক্ত কয়লা সরবরাহ করতে বাধ্য হচ্ছে প্রশাসন। গত বছর গুজরাত, পাঞ্জাব, রাজস্থান, তামিলনাড়ুতে প্রভূত বৃষ্টির ফলে কয়লার উৎপাদন ব্যহত হয়েছিল। বিদ্যুৎ সঙ্কটের সমাধান কল্পে জরুরি ভিত্তিতে বিকল্প পথে সন্ধান করাটা এখন খুবই জরুরি হয়েছে। তাছাড়া জলবায়ু সম্মেলনে সিদ্ধান্তই হয়েছে, পরিবেশ দূষণ রুখতে, বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রা রুখতে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমাতেই হবে। বিকল্প পথ অর্থাৎ সৌর বিদ্যুৎ, জল, বায়ুপ্রবাহ ইত্যাদি উৎসগুলির দিকে নজর দিতে হবে। জোর দিতে হবে পরিকাঠামো উন্নতি করার দিকে, তাহলে বিনিয়োগের পথ সুগম হয়, অন্যথায় ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছানোর জোগান শুধু স্লোগানেই থাকবে।

মুমূর্ষু সরকারি স্কুলগুলিকে বাঁচানোর উপায় বের করতে হবে

সম্প্রতি আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এক অনুষ্ঠানে বলেছেন বর্তমানে যে অবস্থা চলছে তাতে মনে হয় দশ বছর পর কোনো ছাত্র ছাত্রী স্কুলে আর পড়তে আসবে না। এই সভায় যে সব তরুণ অভিভাবকেরা ছিলেন, তারা নিজেরা সরকারি স্কুলে পড়লেও নিজেদের ছেলেমেয়েদের ইংরেজি মাধ্যম বেসরকারি স্কুলে পড়াতেই বেশি আগ্রহী। ছাত্রের অভাবে কলকাতা এবং পশ্চিমবাংলার সরকারি ৮৯টি স্কুল বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। —কেন বিগত কয়েক দশকের মধ্যে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হল? নানা সমস্যায় জর্জরিত সরকারি স্কুলগুলি, শিক্ষকের অভাব, নিয়মিত বিদ্যুৎ পরিষেবার অভাব এবং পরিকাঠামো গত নানা সমস্যার ফলে শুধু পশ্চিম বাংলায় নয়, সারা দেশেই সরকারি স্কুলগুলিতে পড়ুয়ার সংখ্যা দ্রুত কমছে। বর্তমানে সারা দেশে প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মোট পড়ুয়ার সংখ্যা প্রায় ২৫ কোটি ১০ লক্ষ, তার মধ্যে ১২ কোটি বেসরকারি স্কুলের পড়ুয়া।

তবে অন্যান্য রাজ্যগুলির তুলনায় পশ্চিমবাংলায় সরকারি স্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যার নিরিখে তুলনামূলক ভাবে ভাল হলেও, পরিকাঠামোর দুর্বলতার ফলে সরকারি স্কুলে শিক্ষার মান নীচের দিকে নামছে। যথেষ্ট পড়ুয়া থাকা সত্ত্বেও সরকারি স্কুলগুলির এক বড় অংশ বিশেষত গ্রামাঞ্চলের স্কুলগুলি শিক্ষক শূন্যতায় ভুগছে। যেখানে শিক্ষক ছাত্রের অনুপাত হওয়া উচিত ১ : ৪০। সর্বত্র সাধারণ অনুপাত হয়েছে ১ : ৯০, ১ : ৮৮ বা ১ : ৯২। তাছাড়া গ্রামের স্কুলের শিক্ষকদের শহরমুখী বদলির জোয়ারে গ্রামের ইস্কুলগুলিতে শিক্ষকদের সংখ্যায় ভাঁটা পড়ছে।

প্রসঙ্গত দিল্লীতে, সরকারি স্কুলগুলি প্রাইভেট স্কুলগুলিকে টেক্কা দিচ্ছে। সম্প্রতি পরিকাঠামোর প্রভূত উন্নয়ন ঘটিয়ে বহু পড়ুয়া বেসরকারি স্কুল ছেড়ে সরকারি স্কুলে ভর্তি হচ্ছে। দিল্লী মডেলটা একটু খতিয়ে দেখলে হয় না?

মার্কসীয় দর্শন এবং রাজনৈতিক অর্থনীতির আলোকে ‘প্রোলেতারিয়ান ডিক্টেটরশিপ’

পার্থসারথি দাশগুপ্ত

‘ডিক্টেটরশিপ’ শব্দটি মার্কস-এঙ্গেলস যেভাবে বোঝাতে চেয়েছিলেন সেখান থেকে কিছু ঐতিহাসিক কারণেই তা ক্রমশ চূড়ান্ত কর্তৃত্ববাদ, অথরিটি, হেজিমনি বা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার একাধিপত্য ইত্যাদি অর্থে বা সংজ্ঞায় বিচ্যুত হয়ে পড়েছে। সরাসরি বলতে গেলে ওঁরা ‘প্রোলেতারিয়ান ডিক্টেটরশিপ’ বলতে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের স্তরে বা উৎক্রমনকালে গণতন্ত্রের অনুশীলনের যাত্রাপথে একটি অস্থায়ী রাজনৈতিক অবস্থা বোঝাতে চেয়েছেন। সেই বিশেষ উৎক্রমণকালে প্রোলেতারিয়েত শ্রেণি এক অস্থায়ী ক্রমবিলীয়মান রাষ্ট্রব্যবস্থাকে তাদের নিজেদের শ্রেণিসহ পণ্যের নিয়মের বিলোপের লক্ষ্যে বুর্জোয়া ডিক্টেটরশিপের (তথাকথিত বুর্জোয়া গণতন্ত্রের) বা শাসন ক্ষমতার সমস্ত শর্তগুলিকে ধ্বংস করছে। কারণ বুর্জোয়া গণতন্ত্রে প্রাপ্ত গণতান্ত্রিক অধিকারের তুলনায় তাঁদের গুণগতভাবে মৌলিক এবং উন্নততম গণতন্ত্রের অনুশীলনের পথে যেতে হবে। যে অর্থনৈতিক কাঠামোর ওপর বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক উপরিকাঠামো, পেরিয়ে আসা অন্যান্য শোষণমূলক সমাজের উপরিকাঠামোর অবশেষ সহ গড়ে উঠেছিল, তা কখনোই পুঁজিবাদী উদ্বৃত্ত শ্রম শোষণভিত্তিক মূল্যের বিধিবিধানকে অতিক্রম করে উঠতে পারছিল না। এবার এই উৎক্রমনকালে সর্বহারা শ্রেণির কাজ একদিকে পুরানো অর্থনৈতিক কাঠামোটিকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া, সঙ্গে সঙ্গে নিজেরাই বিষয়ীতে উত্তীর্ণ হয়ে উন্নততম গণতন্ত্রের সুপারস্ট্রাকচারটা মজবুতভাবে গঠন করা। খুব স্বল্পকথায় গোথা কর্মসূচির সমালোচনা প্রসঙ্গে প্রোলেতারিয়েত শ্রেণির একনায়কত্বের বিষয়টি তুলে ধরেছেন মার্কস ঃ—

Between capitalist and communist society lies the period of the revolutionary transformation of the one into the other. Corresponding to this also a political transition period in which the state can be nothing but the revolutionary dictatorship of the proletariat.”

মার্কস-এঙ্গেলস দর্শন এবং পোলিটিকাল ইকোনমির বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রমাণ করেছেন যে ‘শ্রমিক শ্রেণির মুক্তি শ্রমিক শ্রেণির কাজ’। তাঁরা দেখিয়েছেন, মহান কোন আবিষ্কার, চিন্তানায়ক বা মহাপুরুষের আবির্ভাব অথবা শ্রেষ্ঠ দার্শনিক তত্ত্ববিদের হস্তক্ষেপ নিরপেক্ষভাবে এই ঐতিহাসিক পরিণতি ঘটাতে বাধ্য। অর্থাৎ পুরানো অর্থনৈতিক কাঠামো ও সুপারস্ট্রাকচারের ধ্বংস এবং শ্রেণিশোষণহীন অর্থনৈতিক কাঠামো নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে সেই কাঠামোর সহযোগী সুপারস্ট্রাকচার গঠনের প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়া অবশ্যই শ্রমিকশ্রেণির কোনো এজেন্টের কর্ম নয়। গুটিকয় অতিজ্ঞানী সর্বত্যাগী বিপ্লবীর স্বেচ্ছাসেবিতামূলক চূড়ান্ত কর্মসূচি গ্রহণেও তা সম্ভব নয়। অথবা ইতিহাস যখন এই পরিণতির যাথার্থ্য নির্দেশ করে সুতরাং চরম নির্ধারণবাদী কর্মসূচি শ্রমিক শ্রেণিকে এ রূপান্তরের কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অতি সহজেই করার শর্ত তৈরি করবে, তাও নয়।

সুতরাং সর্বহারা শ্রেণিকে নিজেদের মধ্যেই নিজেদের সচেতন বিষয়ীতে উত্তীর্ণ হয়ে বুর্জোয়াশ্রেণির সমস্ত ধরনের আধিপত্যের প্রভাব, বন্ধন ও শ্রেণিশোষণের শেষ চিহ্নগুলি টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে বুর্জোয়া শ্রেণির হিংস্র আক্রমণগুলি বিচূর্ণ করে যাবে, করেই যাবে। ধ্বংস করে যাবে পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রক্রিয়ার শাসন বিধান সামরিক প্রতিক্রিয়া সহ সামাজিক সাংস্কৃতিক অমঙ্গলকর অমানবিক উপরিকাঠামো।

এজন্য সংখ্যাগুরুর শাসনের স্বার্থে বিশেষ ঐতিহাসিক কালে সংখ্যালঘুর উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে যে অস্থায়ী বিলীয়মান রাষ্ট্রযন্ত্রটি প্রোলেতারিয়েতের আধিপত্যে বাধ্য হয়েই আধা রাষ্ট্র রূপে ব্যবহার করতে হচ্ছে, পুরনো শোষণমূলক রাষ্ট্রযন্ত্রের মতো তা সমগ্র সমাজের ওপর চেপে বসা বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্রযন্ত্র নয়। তবুও মানুষের প্রাক্-ইতিহাসের অবসানের ঐতিহাসিক দায়বদ্ধতায় কর্তৃত্বমূলক (dictatorial) প্রয়োজনে সংখ্যালঘু শোষকশ্রেণির বিরুদ্ধে দখলকারী হিংসাত্মক কাজগুলি ঐ উৎক্রমণকালে সর্বহারা শ্রেণিকে করতেই হচ্ছে। লক্ষ্য, বাধ্যতামূলকভাবে ঐসব হিংসাত্মক কাজগুলির সার্বিক প্রয়োজনের অবলুপ্তি—শ্রেণিহীন গণতন্ত্রই হবে ঐ সময়ে সর্বহারা শ্রেণির লক্ষ্য।

শ্রেণির উদ্ভব এবং শ্রেণি বিলুপ্তির ধারণার প্রেক্ষিতে ব্যক্তিসত্ত্বার উদ্ভবের ঐতিহাসিক বিকাশ যে বুর্জোয়া মূল্যবোধের সূত্রপাতের অনেক আগেই ঘটেছে তা প্রমাণ করেছেন মার্কস-এঙ্গেলস জার্মান ইডিওলজিতে। সেই বিষয়টির উপর সমধিক গুরুত্ব দিয়েছেন ওঁরা। প্রতিটি শ্রেণিবিভক্ত সমাজে শুধুমাত্র বেঁচে থাকার বাস্তব তাগিদেই মানুষ একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। শুধুমাত্র একটি বিশেষ শ্রেণির বিরুদ্ধে উদ্বৃত্ত শ্রম শোষণের বিশেষ ধরনের জন্যই বহু সংখ্যক একক ব্যক্তিকে সমস্বার্থে একটি বিশেষ শ্রেণির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ subsumed হতে হয়। সুতরাং একক ব্যক্তি তার বেঁচে থাকার শর্তগুলি যে বিশেষ সূত্রে গ্রথিত, সেই বাস্তবতাটাকে এড়িয়ে যেতে পারে না বলেই নিজস্ব শ্রেণির সামগ্রিক সমসত্ত্ব চরিত্রের অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে। এভাবেই মার্কস-এঙ্গেলস-এর মূল্যবান হাইপোথিসিসের যৌক্তিক ভূমি প্রস্তুত হয়। তাই জার্মান ইডিওলজির মূল বক্তব্য সামাজিক তথা অর্থনৈতিক শ্রেণিসমূহ, শ্রেণিভুক্ত একক ব্যক্তির তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণে একটি বিশেষ লক্ষ্যে শ্রেণির সকলের স্বার্থ রক্ষা করতে সক্ষম। আর একক ব্যক্তি সত্তার এই বিশেষ শ্রেণির মধ্যে subsume বা মিশে যাওয়ার প্রক্রিয়া তখনই মিলিয়ে যাবে, যখন শ্রেণিসমূহের বিলুপ্তি ঘটবে। এভাবেই কার্ল মার্কস একক ব্যক্তির সামাজিক উৎপাদন প্রক্রিয়ার ভূমিকা ও তাঁর চেতনার বিকাশকে ইতিহাস নির্দিষ্ট ঘটনা বলে ব্যাখ্যা করেছেন। তাই মানবসমাজের বিবর্তনের গতি তাঁর কাছে নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক বস্তুবাদী প্রক্রিয়া।

দর্শনের ভিত্তিতে সামাজিক বিবর্তনের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার পর ১৮৬৫ সালে শ্রমের মূল্যতত্ত্ব এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতির কাঠামোজাত সংকট ইত্যাদি সম্পর্কিত গবেষণার মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদের ঐতিহাসিক পর্যায়কে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেন। উৎপাদনের উপকরণ এর সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক তথা বহু ব্যক্তিমানুষের সামবায়িক ঐক্য, শ্রেণিবিভক্ত সমাজে সেই ঐক্যের ফাটল, অবক্ষয়, বিচ্ছিন্নতা। অবশেষে সেই আদিম ঐক্যের পরিশীলিত উন্নত পুনর্সৃজন। ব্রিটেনের শ্রমিক শ্রেণির কাছে বক্তৃতায়, ‘Original Union’, ‘its decomposition’ এবং ‘restoration of original union in new historical form রূপে ঐতিহাসিক স্তরগুলি ব্যাখ্যা করেন। সেই প্রখ্যাত বক্তৃতারও দশ বছর পরে সর্বহারা শ্রেণির ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্পর্কিত ব্যাখ্যা করতে গোথা কর্মসূচির সমালোচনা প্রসঙ্গে সেই original union-এ উৎপাদনের শর্ত—প্রকরণ প্রভৃতির নিরিখে আদিম অন্বয় থেকে যে ঐতিহাসিক স্তরে separation অনন্বয় বা বিচ্ছিন্নতা থেকে সর্বশেষ উন্নততম মাত্রার অন্বয় অর্থাৎ restoration of the original union in a new historical form কেই মার্কস সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদ বলে বোঝাতে চেয়েছেন।

এই restoration to original union এর কাজটাই উৎক্রমণকালে সচেতন বিষয়ীতে উত্তীর্ণ শ্রমকারী শ্রেণির কাজ। বাস্তবে পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমজীবী মানুষের অর্থাৎ অধিকাংশের ব্যক্তি-মালিকানার অবসানটা তো হয়েই গেছে। এবারের কাজ যে ন্যূনতম সংখ্যক মানুষের হাতে পুঁজির স্বার্থে উৎপাদন প্রকরণের মালিকানা এসেছে তারও অবসান করা। পুঁজিপতি শ্রেণির একচ্ছত্র একাধিপত্য যে রাষ্ট্রব্যবস্থার সহায়তায় উৎপাদনের প্রকরণের মালিকানা দখল করেছিল এতদিন, তাকে ধ্বংস করবে সর্বহারা শ্রেণির একনায়কত্ব। সাময়িক কালপর্যায়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব চলাকালীন উৎক্রমণকালে উৎপাদনের প্রকরণের উপর কেন্দ্রীভূত অধিকারকে রাষ্ট্রের অধিকার বলতে চাননি মার্কস, ‘সামাজিক মানুষের যৌথ সামাজিক অধিকার ধরনের’ কিছু বলে বার বার বোঝাতে চেয়েছেন। সমগ্র উৎপাদক সমাজের বদলে কোনও দল, গোষ্ঠী, আমলাতন্ত্র বা একক ব্যক্তির আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রবণতাগুলি ধ্বংস করার লক্ষ্যে এই সামাজিকীকরণ কিন্তু রাষ্ট্রীয়করণ নয়। বিভিন্নভাবে বিভিন্ন বার মার্কস-এঙ্গেলস তত্ত্ব ও অনুশীলন, উভয় প্রেক্ষিতেই এই বিষয়টির অবতারণা করেছেন।

সমাজতন্ত্রে উত্তরণের লক্ষ্যে উৎক্রান্তিকালীন সমাজকে মার্কস কখনোই সমাজতান্ত্রিক সমাজ বা সাম্যবাদী সমাজ বলে চিহ্নিত করেননি। এই সর্বহারাশ্রেণির একনায়কত্বে চলাকালীন সমাজে সম্পত্তি সম্পর্ক, সামাজিক শ্রম বিনিময় মূল্য, মূল্যের বিধিবিধান কোনোদিক দিয়েই তখনই সমাজতন্ত্রের গুণগত মাত্রায় উত্তীর্ণ হয়নি। সুতরাং কাঁঠালের আমসত্ত বা সোনার পাথরবাটির মতো শ্রেণি থাকবে, পণ্যমূল্য-বাজার থাকবে, উদ্বৃত্ত শ্রমশোষণ থাকবে—তাকে সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদ বলাই চলে না।

আপাতদৃষ্টিতে গণতন্ত্র ও একনায়কত্ব শব্দদ্বয়কে পরস্পর বিরোধী শব্দ বলে মনে হলেও ‘ডিক্টেটরশিপ’ শব্দটিকে মার্কস সর্বপ্রথম জার্মানীর বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব চলাকালীন পর্যায়ে ‘ডিক্টেটরশিপ অফ দি ডেমোক্রেসী’ শব্দরূপে ব্যবহার করেছেন। ১৮৪৮-৪৯ সালে শ্রমিক শ্রেণি, কৃষক সম্প্রদায় ও নিম্নবিত্ত পেটিবুর্জোয়া গোষ্ঠীর মোর্চাকে ‘দি ডেমোক্রাট’ বলে চিহ্নিত করা হত। সংগ্রামী গণতান্ত্রিক শ্রেণির মোর্চার মিলিত জঙ্গী আন্দোলন এবং সমাজে এদের যৌথ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন মার্কস-এঙ্গেলস। অর্থাৎ ডিক্টেটরশিপের অর্থ অভিজাততন্ত্র সহ তথাকথিত উদারনৈতিক প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগের শক্তি অর্জনকারী গণতান্ত্রিক মঞ্চের আধিপত্যের প্রয়োজনীয় অবস্থা। মার্কস সুস্পষ্টভাবে অচল প্রশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার শক্তির বিকল্পে গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার ওপর জোর দেন। অর্থাৎ যা প্রতিক্রিয়ার শক্তির কাছে শোষিত শ্রেণির একনায়কত্ব, তা-ই খেটে খাওয়া মানুষের কাছে গণতন্ত্র। বাস্তবে রাজতন্ত্রে যে মাত্রায় গণতন্ত্র ছিল, তার তুলনায় উন্নততর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যই সংগ্রামী শ্রেণির গণতান্ত্রিক শাসন বা একনায়কত্ব প্রয়োজন।

জার্মানীর গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতা-ঋদ্ধ মার্কস-এঙ্গেলস সর্বহারাশ্রেণির ঐতিহাসিক ভূমিকার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করার বাস্তব কারণসমূহ এভাবেও ব্যাখ্যা করলেন। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে পেটিবুর্জোয়া বা উদারনৈতিক বুর্জোয়া গোষ্ঠীগুলির দোলায়মান শ্রেণিচরিত্র তুলে ধরেন। সর্বহারা শ্রেণির সর্বময় কর্তৃত্ব বা হেজিমনিই একমাত্র শোষণমুক্ত সমাজের কাণ্ডারী। মার্কসীয় চেতনায় এভাবেই বৈজ্ঞানিক সত্য সহ পূর্বোক্ত উৎপাদন প্রকরণের উপর সামাজিক আধিপত্য নির্মাণকারী সমাজের লক্ষ্যে সক্রিয় শ্রেণি বা original union restoration এর জন্য associated producer অর্থাৎ সর্বহারাশ্রেণির একনায়কত্ব (Proletarian dictatorship) গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের শ্লোগানকে প্রতিস্থাপিত করল।

মার্কস প্রোলেতারিয়েতের একনায়কত্বের বিপ্লবী ভূমিকা সম্পর্কে সুস্পষ্ট বাস্তব অভিজ্ঞতা ভিত্তিক বক্তব্য রাখলেন সর্বপ্রথম ‘দি ক্লাস স্ট্রাগল ইন ফ্রান্স’-এ। পুঁজিপতি শ্রেণির শাসনকে তিনি সেই শ্রেণির একনায়কত্ব হিসাবে প্রতিটি বাক্যে ও অর্থে ব্যবহার করেছেন। বুর্জোয়া-শ্রেণিশাসন বা একনায়কত্বের বিভিন্ন ধরনধারণ থাকলেও অর্থাৎ সংসদীয় গণতন্ত্রে অনেক গণতান্ত্রিক উপাদান থাকলেও তা বুর্জোয়া ডিক্টেটরশিপ ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি ‘ক্লাস স্ট্রাগল ইন ফ্রান্স’-এ বার বার বুর্জোয়া শ্রেণিভুক্ত রাজনৈতিক নেতৃত্বের উদ্ধৃতি ব্যবহার করে দেখিয়েছেন যে, তাঁরা স্বীকার করছেন যে অধিকাংশ জনগণের গণতান্ত্রিক সম্মতির উপর দাঁড়িয়ে তাঁরা যে ডিক্টেটরশিপ অর্জন করেছেন, জনগণের সম্মতির তোয়াক্কা না রেখেই সেই হেজিমনি রক্ষা করাই তাদের শ্রেণিগত দায়বদ্ধতা। ফ্রান্সে ১৮৪৯ সালে গণআন্দোলনের মাধ্যমে যে সাংবিধানিক দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র গঠিত হয়েছিল তা কার্যত বুর্জোয়া শ্রেণি সহ অন্যান্য শোষক শ্রেণির একনায়কত্বমূলক শাসন।

সর্বহারা শ্রেণির একনায়কত্ব বা গণতন্ত্রের ব্যাখ্যার এই ভূমিকা উপস্থাপনের প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, যে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতেই সর্বপ্রথম মার্কস-এঙ্গেলস তাদের যুগান্তকারী রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ মুহূর্তে এই একনায়কত্বের মৌলিক ধারণা নির্মাণ করে দুনিয়ার মুক্তিকামী মানুষের কাছে বার্তা পাঠিয়েছেন।

রাষ্ট্র এবং রাজনীতির শ্রেণিগত প্রেক্ষিতে নিপীড়ন এবং কর্তৃত্বের শাসনে সমাজতান্ত্রিক সমাজেও কি বুর্জোয়া রাষ্ট্রের মতো নিপীড়ন থাকবে, এই প্রশ্নটিই বার বার ফিরে ফিরে আসে। শ্রেণি অবলুপ্ত সমাজে প্রশাসন যারা পরিচালনা করবে তারা কিভাবে এই অভূতপূর্ব আপাত অলীক পরিকাঠামোটি নির্মাণ করে চিরসুন্দর শ্রেণিহীন সমাজের স্থায়িত্ব দেবে, সেই প্রশ্ন থেকেই যায়। আর যান্ত্রিক নির্ধারণবাদ এবং স্বেচ্ছাচারিতামূলক নির্ধারণবাদ মুক্ত সামাজিক চেতনাসমৃদ্ধ এই প্রশ্নের অন্তর্নিহিত গতিময়তাই প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করে দেবে ভবিষ্যতের ইতিহাস নির্দিষ্ট ঘটনার কালক্রমে।

শান্তিপূর্ণ ছাত্র-যুব আন্দোলনে নৃশংস পুলিশী হামলা

এস এস সি নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে যে সকল দুর্নীতিগ্রস্ত নেতা-মন্ত্রীদের নাম বাগ কমিটির রিপোর্টে প্রতিফলিত হয়েছে, তাদের সকলের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং অবিলম্বে এস এস সি সহ সমস্ত রাজ্য সরকারি দপ্তরে শূন্যপদে স্বচ্ছতার সাথে স্থায়ী লোক নিয়োগের দাবিতে ২৭ মে বামপন্থী ছাত্র-যুবদের পক্ষ থেকে 'আচার্য সদন চলো' ডাক দেওয়া হয়। বর্তমান রাজ্য সরকারের পুলিশ যেভাবে চোরেদের আড়াল করছে এবং ন্যায্য দাবিতে সংগঠিত আন্দোলনকে বর্বরোচিত ভাবে দমন-পীড়ন করছে তার আগাম অনুমান বাম ছাত্র-যুব নেতৃত্বের ছিল। তাই ২৬ মে গোপনভাবে বাম ছাত্র-যুব নেতৃত্ব এক জায়গায় সম্মিলিত হয়ে কম. রাজীব ব্যানার্জির সভাপতিত্বে একটি সভা করে। সেই সভায় আর ওয়াই এফ-এর প্রস্তাব অনুযায়ী পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে মিছিল করে আচার্য সদন পৌঁছানোর একাধিক পরিকল্পনা করা হয় এবং সব পরিকল্পনাই গোপন রাখা হয়েছিল। বাম ছাত্র যুব নেতৃত্বের আশঙ্কা সত্য বলে শুরুতেই প্রমাণিত হয়। নেতৃত্বদের মধ্যে বোঝাপড়া অনুযায়ী প্রত্যেক সংগঠনের এক বা একাধিক কমরেডকে করুণাময়ী বাস স্ট্যান্ড চত্বরে রাখা হয়েছিল যারা, প্রতিনিয়ত যার যার নেতৃত্বকে আপডেট দিতে থাকবে। বেলা ২·৩০টা থেকেই সবকটি সংগঠনের নেতৃত্বের কাছে খবর আসতে শুরু করে যে, পুলিশ আন্দোলনকারীদের গ্রেপ্তার করা শুরু করে দিয়েছে। প্রথমে গ্রেপ্তার হন এ ওয়াই এফ-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড তাপস সিনহা সহ ১৪ জন কমরেড। তৎক্ষণাৎ নিজেদের বোঝাপড়া অনুযায়ী প্ল্যান তিন প্রয়োগ করা হয়। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যারা গ্রেপ্তার হয়নি তারা সকলেই সিটি সেন্টার ১-এ জমায়েত হয়ে মিছিল শুরু করবে।

বেলা সাড়ে তিনটা নাগাদ সেই মতন বাম ছাত্র যুব সংগঠনসমূহের সমস্ত নেতৃত্ব ও কমরেডগণ ঐ স্থানে সমবেত হয়ে পড়েন। আর ওয়াই এফ ও পি এস ইউ-এর ৫০ জন সহ প্রায় তিনশত ছাত্র-যুব কমরেডদের নিয়ে আর ওয়াই এফ-এর কমরেড রাজীব ব্যানার্জি, কমরেড সব্যসাচী ভট্টাচার্য, কমরেড আদিত্য জোতদার, ডি ওয়াই এফ আই-এর রাজ্য সম্পাদিকা কমরেড মীনাক্ষী মুখার্জি, ডি ওয়াই এফ আই নেতা কমরেড কলতান দাশগুপ্ত, সারা ভারত যুব লীগের সম্পাদক কমরেড সমন্বয় বিশ্বাস-এর নেতৃত্বে আচার্য সদনের উদ্দেশ্যে মিছিল শুরু করে। ছাত্র-যুবদের ঘোষিত কর্মসূচির আচমকা এই পরিবর্তনে পুলিশ প্রথমে কিছুটা দিশাহারা হয়ে পড়ে। তবে প্রথাগত ভাবে প্রতিদিন সিটি সেন্টার-১-এ যে পুলিশবাহিনী মোতায়েন থাকে তাদের মাধ্যমে খবর পৌঁছালে বিধাননগরের পুলিশ বাহিনীও আচার্য সদন যাওয়ার পথে প্রতিটা মোড়ে ট্রাফিক গার্ড রেলিং দিয়ে চকিতে ব্যারিকেড তৈরি করে মিছিলের গতিকে শ্লথ করার কৌশল নিয়েছিল। কিন্তু প্রতিবাদমুখী ছাত্র-যুব কমরেডগণের অনড় মেজাজ পুলিশকে কিছুটা পিছু হটতে বাধ্য করে। দৃপ্ত কণ্ঠে স্লোগান দিতে দিতে ছাত্র-যুব কমরেডরা সেই ব্যারিকেড ভেঙ্গে এগিয়ে যেতে থাকেন। প্রথম গার্ড রেলিং ঠেলে ফেলে ছাত্র-যুবরা এগোনোর চেষ্টা করলে ধাক্কাধাক্কিতে কেউ কেউ পড়ে যান, পুলিশ প্রথমে নিরস্ত্র, অসহায় ঐ কমরেডদের লাঠি পেটা করে ও গ্রেপ্তার করে বাসে তুলে নেয়। পুলিশের মনোভাব বুঝে সেখানে না থেমে তৎক্ষণাৎ পরিকল্পনায় বদল ঘটিয়ে ছাত্রী-যুবতী কমরেডদের সামনে রেখে স্লোগান মুখরিত মিছিল সামনের দিকে এগোতে শুরু করে। অতঃপর ইন্দিরা ভবন (যেখানে প্রয়াত কমরেড জ্যোতি বসু থাকতেন) থেকে একটু এগিয়ে মিছিল আবার অনুরূপ আরও একটি পুলিশি বাধার সম্মুখীন হয়। পুলিশ সেখান থেকে কমরেড আদিত্য, কম. মীনাক্ষী, কম. সমন্বয় ও কম. কলতানকে গ্রেপ্তার করে নেয়। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে জনা পঞ্চাশ কমরেডকে নিয়ে কম. রাজীব ব্যানার্জি আচার্য সদনের দিকে যখন এগোতে শুরু করেন তখনই লক্ষ করা যায় আন্দোলনকারীদের গ্রেপ্তার করে একটি বাসে পুলিশ আসছে। নির্দেশ মাত্রই কমরেডরা সেই বাসকে করুণাময়ী বাস স্ট্যান্ডের কাছের মেট্রো স্টেশনের নীচে আটকে দেয়। সেই সুযোগে গ্রেপ্তার হওয়া বাম ছাত্র-যুবদের অনেকেই বাসের পিছনের ইমারজেন্সি গেট নিয়ে নেমে আসেন এবং গ্রেপ্তার করা কমরেডদের নিঃশর্তে মুক্তি দেওয়ার দাবিতে সোচ্চার হতে থাকে। এই গণতান্ত্রিক পথে ছাত্র-যুবরা যখন প্রতিবাদ করছেন তখন, পুলিশ বাসের ভিতর বসে থাকা কমরেডদের সব ধরনের মানবাধিকার লংঘন করে ভিতরে এবং বাইরে থেকে লাঠিচার্জ করা শুরু করে। যার ফলে কমরেড আদিত্য সহ অনেকেই আহত হন।

স্বভাবতই এরপরেই ছাত্র-যুবদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায় এবং তাদের সাথে পুলিশের ধস্তাধস্তি শুরু হয়। নিরস্ত্র আন্দোলনকারীদের উপর পুলিশবাহিনী এরপরে দুদিক থেকে বেপরোয়াভাবে লাঠি চালাতে শুরু করে। বেশ খানিকক্ষণ এরূপ চলার পর পুলিশ সকলকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয় এবং ঐ স্থান থেকে মোট ৩৭ জনকে বিধাননগর সাউথ থানায় নিয়ে আসে। মজার বিষয় হল, এই থানায় আনার পরে পুলিশ বলে তারা নাকি ভুল করে এখানে এনেছে। সাউথ থানার পুলিশের এই বয়ানে প্রতিবাদী ছাত্র-যুবরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং থানা চত্বরের ভিতরে অবস্থান শুরু করে দাবি করতে থাকে যে তারা অন্য কোথাও যাবে না। অতঃপর থানা চত্বরের ভিতরে পুলিশ আবার অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে এবং আন্দোলনকারীদের টানা হেঁচড়া শুরু করে দেয়। তবে অন্য কোথাও নিয়ে যেতে সফল হয়নি। এদিন নিউটাউন, রাজারহাট ও বিধাননগর সাউথ থানায় বাম ছাত্র-যুব আন্দোলনের প্রথম সারির প্রায় সকল নেতৃত্ব সহ মোহ ১৫০ জন কমরেডকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এ আই এস এফ-র রাজ্য সম্পাদক কম. বিক্রম পুলিশের নৃশংস আক্রমণের ফলে গুরুতর জখম হয়ে প্রথমে বিধাননগর হাসপাতালে পরে এন আর এস হাসপাতালে ভর্তি হতে বাধ্য হন। সন্ধ্যার পরে তিনটি থানা থেকে গ্রেপ্তার হওয়া কমরেডগণকে ছাড়াতে কম. সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে একদল আইনজীবী, কম. সব্যসাচী ভট্টাচার্য, কম. স্বপন মাইকাপ, কম. সৌম্য দাস, কম. সঞ্জীব সেন, কম. অপূর্ব জোতদার সহ গণ আন্দোলনের অসংখ্য মানুষ তিনটি থানার বাইরে সমবেত হয়েছিলেন। সবশেষে কম. রাজীব ব্যানার্জি, কম. সব্যসাচী ভট্টাচার্য, কম. আদিত্য জোতদার, কম. সঞ্জীব সেন, কম. মিনাক্ষী মুখার্জী, কম. কলতান দাশগুপ্ত, কম. সমন্বয় বিশ্বাস, কম. তাপস সিনহা রাজারহাট থানার সামনে মিলিত হন এবং আগামী ১ জুন পরবর্তী আন্দোলনের রূপরেখা চূড়ান্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

বিধাননগর পুলিশের এই ঘৃণ্যতম অত্যাচারের বিরুদ্ধে সারা রাজ্য জুড়ে হাতে লেখা পোস্টার, সম্ভব হলে পথসভা বা মিছিলের মাধ্যমে পি এস ইউ-কে সাথে নিয়ে আর ওয়াই এফ-এর একক উদ্যোগে প্রতিবাদ কর্মসূচি গ্রহণের জন্য আর ওয়াই এফ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে সকল জেলা কমিটির কাছে আবেদন জানানো হয়।

কলকাতায় ১৫টি বামপন্থী দলের বিক্ষোভ অবস্থান

১-এর পাতার পর

প্রতিকার করতে হলে আরও ব্যাপক ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদী গণআন্দোলন সংগঠিত করতেই হবে। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন যে, জ্বালানি তেল বা রান্নার গ্যাস কেরোসিন প্রভৃতির মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গেই রেলের যাত্রীভাড়াও প্রভূত পরিমাণে বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। 'ডাইনামিক ফেয়ারের' নাম করে যাত্রী সাধারণ লুণ্ঠিত হচ্ছেন। দীর্ঘকাল যাবৎ চালু বর্ষীয়ান মানুষেরা যে সামান্য সুবিধা ভাড়ার ক্ষেত্রে পেতেন তাও প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। সম্পূর্ণ অরাজক এক অবস্থা বিরাজ করছে।

কম. ভট্টাচার্য ১৫টি দলের নেতৃত্বকে ধন্যবাদ জানিয়ে আবেদন করেন যে, ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে সমস্ত ভয়ভীতি উপেক্ষা করে সাধারণ মানুষকে সন্নিবেশিত করার মাধ্যমে জনগণের নিবিড় ঐক্য গড়ে তোলার মাধ্যমেই বর্তমান দুরবস্থা থেকে মুক্তির পথে অগ্রসর হতে হবে।

বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সি পি আই নেতা কম. স্বপন ব্যানার্জী। তিনি বলেন যে, রাজ্যের মানুষ বিজেপি ও তৃণমূলের মধ্যে যে গোপন বোঝাপড়া চলছে তা, বিলক্ষণ উপলব্ধি করছেন। তিনি বলেন, আর এস এস-র মতো এক দেশবিরোধী অপশক্তির সঙ্গে গভীর সম্পর্ক রেখে চলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। দুর্নীতির বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে যে তদন্ত চলছে তাকে প্রভাবিত করতেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর এস এস-এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলছেন। লাগাতার মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধেও তৃণমূল কংগ্রেস সে কারণেই তেমন কোনও সমালোচনা করছে না। সাধারণ মানুষ প্রবল বিপদের মধ্যে রয়েছেন। আন্দোলনের তীব্রতা বাড়িয়েই বর্তমান অবস্থা থেকে মুক্তির পথ খুঁজতে হবে।

ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা কম. সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, সি পি আই (এম এল) লিবারেশন নেতা কম. কার্তিক পাল, মার্কসবাদী ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা কম. আশিস চক্রবর্তী, পি ডি এস নেত্রী কম. অনুরাধা পুততুণ্ড, সি পি বি নেত্রী কম. বর্ণালী মুখার্জী, সি পি আই (এম) পলিটব্যুরোর সদস্য কম. সূর্যকান্ত মিশ্র প্রমুখও সভায় বক্তব্য রাখেন।

সভার সর্বশেষ বক্তা ছিলেন সি পি আই (এম)-এর রাজ্য সম্পাদক কম. মহঃ সেলিম। তিনি কটাক্ষ করে বলেন যে বিজেপি ও তৃণমূল উভয় দলই লুটে পুটে খাওয়ার পথে চলেছে। এরা মিলিতভাবেই দেশের কর্পোরেট কোম্পানিগুলিকেও এই লুণ্ঠনের অপকর্মে সহায়তা করছে। তিনি নির্দিষ্টভাবে বলেন যে, যখনই দেশের মানুষ তাঁদের জীবনের মৌলিক সমস্যাগুলির নিরসনে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের পথে চলতে শুরু করে তখনই, বিজেপি-আর এস এস চক্র ধর্মীয় জিগির তুলে সেই গণআন্দোলনকে বিপথগামী করার অপচেষ্টা করে।

কম. সেলিম আরও বলেন যে, দেশের জল জঙ্গল ও মাটি দেশি বিদেশি বড় বড় কোম্পানিগুলির কাছে জলের দরে বিক্রি করতে উদগ্রভাবে অগ্রসর হয়েছে মোদী সরকার। দেশকে দেউলিয়ায় পরিণত করার অপচেষ্টা করে চলেছে বিজেপি। তৃণমূল তাদের স্যাঙাৎ। এই উভয় অপশক্তিকে পর্যুদস্ত করার লক্ষ্যে সাধারণ মানুষের আন্দোলনকে আরও পরিব্যাপ্ত করতেই হবে।

কম. সেলিম আরও বলেন, বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক দলগুলির মধ্যে আরও গভীর ঐক্য গড়ে তুলেই সাধারণ মানুষের দুর্বার ঐক্য গড়ে তোলার দিকে এগোতে হবে। তিনি আরও প্রসারিত ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

ভরতপুর ব্লকে বামফ্রন্টের উদ্যোগে গণঅবস্থান

বামফ্রন্ট এবং সহযোগী দলসমূহের সারা রাজ্যজুড়ে এক সপ্তাহব্যাপী মিটিং, মিছিল, প্রচার এবং গণঅবস্থান কর্মসূচির শেষপর্বে গত ৩১ মে ভরতপুর ব্লক অফিসের সামনে বামফ্রন্টের উদ্যোগে গণঅবস্থান ও বিক্ষোভ সংগঠিত হয়। মূলত, সাম্প্রদায়িক চক্রান্ত রোধে, আনিস খানের হত্যার ন্যায়বিচারের দাবিতে, আমতলায় জলের ট্যাঙ্ক স্থাপনের দাবিতে, শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য ও দুর্নীতির প্রতিবাদে, পেট্রোল ডিজেল রান্নার গ্যাসসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যদ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে, স্বচ্ছ ও ধারাবাহিক পদ্ধতিতে স্থায়ী পদে সরকারি চাকরির দাবিতে এবং গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পে বরাদ্দ বাড়ানো সহ ১০০ দিনের বদলে ২০০ দিনের কাজের দাবিতে বামফ্রন্ট এই সমাবেশ সংগঠিত করে। গত ৩১ মে মুর্শিদাবাদ জেলার ভরতপুর ব্লকের সামনে বামফ্রন্টের উদ্যোগে অবস্থান বিক্ষোভ সংগঠিত হয়। এই সভাতে বক্তব্য রাখেন আর এস পি ভরতপুর লোকাল কমিটির সম্পাদক জামাল চৌধুরী ও পিএসইউ এর সাধারণ সম্পাদক নওফেল মহঃ সফিউল্লা সহ অন্যান্য বাম নেতৃত্ব। ঐ দিন জেলার বিভিন্ন প্রান্তের ন্যায় সালার ব্লকের সামনে থেকে শহর পরিক্রমা করে বিক্ষোভ মিছিল সালার রেল স্টেশনে শেষ হয়। সেখানে একটি বিক্ষোভ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই বিক্ষোভ মিছিলে প্রায় দুই শতাধিক কর্মী সমর্থক অংশগ্রহণ করে।

পুরুলিয়া জেলায় বামফ্রন্টের সভা

৩০ মে তারিখে রাজ্য বামফ্রন্টের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুরুলিয়া জেলা বামফ্রন্টের উদ্যোগে লাগামছাড়া মূল্য বৃদ্ধি, সীমাহীন বেকারত্ব ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ বিক্ষোভ অবস্থান কর্মসূচি পালিত হয়েছে জেলার চারটি মহকুমা সদর পুরুলিয়া রঘুনাথপুর ঝালদা ও মানবাজারে। পুরুলিয়ার অবস্থানে বক্তব্য রাখেন অন্যান্য বামপন্থী নেতৃত্বের আর এস পি জেলা সম্পাদক কম. অত্রি চৌধুরী ও জেলা নেতা কম. দীপক দাস, সি পি আই এম এর পক্ষে জেলা সম্পাদক কম. প্রদীপ রায়। কম. অত্রি চৌধুরী মূল্য বৃদ্ধি বেকার সমস্যা ও দুর্নীতির বিষয়ে তুলে ধরেন। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের ব্যর্থতা এর জন্য দায়ী। ঝালদার কর্মসূচিতে জেলা নেতা কম. মনোরঞ্জন মাহাতো, মানবাজারে জেলা নেতা কম. করুণাময় মাহাতো ও রঘুনাথপুরে কম. বাসুদেব মাহাতো বক্তব্য রাখেন।

সত্যজিৎ রায়ের ছবি উচ্চবিত্তসুলভ মূল্যবোধের সীমা অতিক্রম করেছে

সুতীর্থ মণ্ডল

সত্যজিৎ রায়ের জীবনীকার এবং চিত্র সমালোচক হিসেবে অ্যান্ড্রিউ রবিনসনের নাম সর্বাগ্রে মনে আসে। অবিরাম সত্যজিতের চলচ্চিত্র দেখেছেন এবং জাতীয় তথা আন্তর্জাতিক আর্থ-সামাজিক পরিসরে গভীর অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন তিনি। তাঁর সবচেয়ে পরিচিত এবং বিশ্বখ্যাত গ্রন্থ 'সত্যজিৎ রায়, ইনার আই'-এ সুদীর্ঘ সময়ব্যাপী সাক্ষাৎকারে প্রতিটি চলচ্চিত্রে সত্যজিৎ-এর শ্রেণি তথা সামাজিক মনোভূমিতে স্বচ্ছন্দ বিচরণ করেছেন।

একটি সাক্ষাৎকারে রবিনসনকে সত্যজিৎ রায় বলেছেন যে, পথের পাঁচালী করার পর থেকেই তিনি তাঁর পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে অনেক বেশি সচেতন হয়েছেন। ইতিপূর্বে তিনি নানা ধরনের ভালোলাগার কাজকর্মের মধ্যে তাঁর শৈল্পিক পিপাসা মেটাবার চেষ্টা করতেন এবং সমস্ত রাজনৈতিক বিষয় থেকে কিছুটা দূরে থেকে ছিলেন। তারপর একদিন রবিনসন যখন জিজ্ঞেস করেছিলেন যে তীব্র শৈল্পিক মনন থাকলে রাজনীতি কি ব্রাত্য হয়ে যেতে পারে? সত্যজিতের জবাব, যদি পরিচালক সমাজ এবং সৎ শিল্পের প্রতি দায়বদ্ধ থাকেন তাহলে রাজনীতি, চারপাশের অবস্থা পারিপার্শ্বিকতা অবশ্যই প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। ১৯৬০ সালের পর থেকে তিনি পরিপার্শ্ব নিয়ে অনেক বেশি সচেতন হয়ে উঠেছেন। গল্পকে না বদলে দিয়েও ছবিতে একটু একটু করে সমাজের রাজনৈতিক মননের অনুপ্রবেশ তাঁর চরিত্রে এবং পারিপার্শ্বিকতায় ঘটেছে।

সত্যজিৎ বলছেন, ১৯৭৪ সালের সীমাবদ্ধ ছবির ক্ষেত্রে সরাসরি রাজনৈতিক অনুষঙ্গ আসার দরকার ছিল না; কিন্তু যখন ককটেল পার্টিতে বাইরে বোমা পড়ার শব্দ শোনা যায় তখন চলচ্চিত্রের চরিত্ররা বোমা পড়া এবং যুব মানসিকতার রাজনীতি নিয়ে অনেক মন্তব্য করতে থাকে। যেমন তখন লোডশেডিং, লিফ্ট অকেজো এইসব বাস্তবতাকে পরিহার করা যায় না। কারণ ছবিটা তো প্রযুক্তির গন্ডগোলের ছবি নয়। এই ছোট ছোট ঘটনা ও আলাপচারিতার অনুপ্রবেশ অবশ্যই চলচ্চিত্রটিকে, তাঁর গল্পটিকে সমৃদ্ধ করেছিল।

একবার অ্যান্ডারসন সরাসরি প্রশ্ন করেছিলেন যে প্রতিদ্বন্দ্বীর মূল চরিত্র তাঁর ভাই নকশালবাড়ি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকা সত্ত্বেও একই সঙ্গে থাকেন। সত্যজিৎ কি এই যুব আন্দোলনকারীদের সাহস এবং সমাজবদলের লক্ষ্যটাকে সমর্থন করেন?

সত্যজিত রায় খোলা মনেই জবাব দেন যে, অবশ্যই তিনি সেই যুবকদের সাহসকে পছন্দ করেন শ্রদ্ধা করেন। কারণ তিনি বলছেন, তিনি তো ওরকম সাহসী মানুষ নন। যাঁরা কোন আদর্শে প্রত্যয়ী হয়ে গুলির সামনে দাঁড়াতে পারেন, প্রাণ দিতে ভয় পান না, তাঁদের কি করে অসম্মান করা যায়। নকশাল আন্দোলনের এই দিকটা সত্যজিৎকে ভীষণ আকৃষ্ট করেছিল। শুধুমাত্র এই শারীরিক এবং মানসিক দিকটা। তিনি তাঁদের রাজনৈতিক বিশ্লেষণ বা প্রত্যয় প্রসঙ্গে অবশ্যই প্রশ্ন তুলেছেন। কিন্তু এই পরিস্থিতির মুখোমুখি তিনি নিজেই দাঁড়াতে সাহস পেতেন না, সেই কথাটি উচ্চারণ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি।

রবিনসনের কাছে তিনি স্বীকার করেছেন, তাঁর সমস্ত ছবিতে নারী চরিত্ররা অনেক বেশি শক্তিশালী। সমাজ এবং পরিবারের মধ্যে নিজেদের সংগ্রাম এবং অভিজ্ঞতার মধ্য থেকেই তাঁরা উঠে এসেছেন। শুধু তাই নয় শারীরিক দিক থেকে কিছুটা দুর্বল এবং প্রতিবন্ধকতার জন্য লিঙ্গগত ভারসাম্যের বিষয়গুলো যেন শুধু বাঙালিয়ানার পরিসরেই নয়, আন্তর্জাতিক স্তরেও লিঙ্গবৈষম্য বিরোধী এবং নারীমুক্তির প্রাসঙ্গিকতা তাঁর ছবির নারী চরিত্রে উপনীত হয়েছে।

প্রসঙ্গত, উদাহরণস্বরূপ মহানগরের নায়িকা আরতির বিষয়টি সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক। একটা প্রতিশ্রুতিসম্পন্না যুবতী, যাঁর সমস্ত বিকাশের সম্ভাবনা সামাজিক এবং পারিবারিক আচার বিচারের মধ্যে ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছিল এবং সেই নারী আশেপাশের এই ছলনার সঙ্গেও অভ্যস্ত হয়ে পড়ছিলেন, সেই গভীর মননের অবক্ষয়ের জায়গাটা সত্যজিৎ এই ছবিটির পরতে পরতে নিপুণ শিল্পীর মতো তুলে ধরেন। স্বাধীনতাপ্রাপ্তি এবং দেশভাগের পর বাঙালি মধ্যবিত্তের জীবনের যে সংকট পরিবারের মধ্যে এসে পড়েছিল! অনেক ক্ষেত্রেই সংসারের মেয়ে চরিত্ররা এগিয়ে এসে ঘরের বাইরে গিয়ে চাকরি করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সংসারের খুঁটিনাটি কাজে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে থাকা আরতি প্রথমদিকে স্বামী সুব্রতর দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে সেলসম্যানের চাকরিতে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সহকর্মী আরতির সঙ্গে পরিচয় হওয়ার মধ্য দিয়ে নারীর আত্মনির্ভরতার সাহসে অভ্যস্ত হতে থাকেন। দ্রুত ঘটনাক্রমে আরতির স্বামীর চাকরি যাওয়া এবং সহকর্মী অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান এডিথের অসুস্থতাজনিত অনুপস্থিতির জন্য বরখাস্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে একদিকে পারিবারিক ক্ষেত্রে আর্থিক নিরাপত্তার সমস্যা ও অপরদিকে সামান্য কারণে এডিথের বরখাস্ত হওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে চাকরি ছাড়া আরতিকে শ্রেণি অবস্থানের পরিসরে স্বাধীন নারী চরিত্রের মাত্রায় উন্নীত করে। আরতি তাঁর নিজের জন্য শ্রেণির অন্বেষণে দুঃসাহসী হয়ে ওঠেন। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর গল্প-উপন্যাসের নারী চরিত্ররা যেন সত্যজিতের চলচ্চিত্রে মানবজমিনের কৃষিজ ফসল। বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক যুগের নারী চারুলতা অথবা ঘরে-বাইরের বিমলা যেন যুগের ভাবধারা ভাবনা ধারণা অতিক্রম করে মনস্তাত্ত্বিক পরিসরে পুরুষতন্ত্রকে আঘাত হেনেছে বার বার। সত্যজিতের সার্থকতা এইখানে যে, তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীর প্রেম এবং বৌদ্ধিক স্বকীয়তাকে সমসাময়িক সামাজিক বেড়াজাল অথবা শারীরিক আত্মসমর্পণের অবস্থানকে ভেঙে ফেলেছেন তাঁর নারী চরিত্রের সাহসিক চিত্রায়নে। কাপুরুষের নায়িকা করুণা বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের দ্বিধা দ্বন্দ্ব এবং ভণ্ডামিতে বিদীর্ণ চরিত্রের মাঝে এক অভূতপূর্ব মনস্তাত্ত্বিক পটভূমি নির্মাণ করেন। একদিকে প্রাক্তন প্রেমিক, অপরদিকে স্বামী প্রতিষ্ঠিত উচ্চমধ্যবিত্ত চা বাগানের ম্যানেজার এর পারিবারিক নিরাপত্তা। অতীতে দুঃসাহসে ভর করে একসাথে ঘর বাঁধার স্বপ্ন চুরমার করে দিয়েছিলেন যে প্রেমিক, বর্তমান স্বামীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক থাক আর না থাক সেই নিরাপত্তা এবং সচ্ছলতার বেড়া ভেঙ্গে নতুন করে অসহায় অনিশ্চয়তার মধ্যে প্রাক্তন প্রেমিকের ঘর বাঁধার ডাক কতটা ভন্ডামি আর কতটা দায়বদ্ধতা সেই ভাবনা থেকেই মানসিক যন্ত্রণা থাকা সত্ত্বেও প্রাক্তন প্রেমিককে প্রত্যাখ্যান করেন করুণা।

একদা গত শতাব্দীর ষাট থেকে আশির দশক পর্যন্ত নব যুগের তিন চলচ্চিত্রকার যাঁরা শুধু দেশেই নয়, দেশের বাইরে ভারতীয় চলচ্চিত্রের মান উন্নত পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছিলেন, সত্যজিৎ রায় হৃত্বিক ঘটক এবং মৃণাল সেনের চলচ্চিত্রের রাজনৈতিক তথা সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক উত্থাপিত হত। আমাদের ধারণা যে কোনো সৃজনমূলক কর্মকাণ্ডে মহৎ শিল্পীর দায় শুধু শুধুমাত্র সঞ্চারিত বা উচ্চকিত ভঙ্গিতে বা স্লোগান ধর্মীতার আঙ্গিকে সমাজবদলের লক্ষ্যটাকে প্রতিফলিত করায় একমাত্র রাজনৈতিক বার্তা নির্মিত হয় না। শিল্পের চরিত্র বিষয় এবং উপাদানের সঙ্গে যখন শিল্পীর সমস্ত ধরনের বিচ্ছিন্নতা চুরমার হয়ে সমাজের আশা বেদনা শোষণ সমস্ত বাস্তবতার সঙ্গে শিল্পীর সৃজন ভূমিতে মননের টানাপোড়েনের চালচিত্র ফুটে ওঠে, তাও কার্যত দর্শক শ্রোতা ও পাঠকের কাছে সমাজবদলের বার্তা পাঠায়। সেই দিক থেকে দেখতে গেলে সত্যজিতের কোন শিল্পই নিছক শিল্পের জন্য শিল্প রূপে নির্মিত হয়নি। যদিও সত্যজিৎ অনেক সময়ই বলেছেন যে সমালোচকরা তাঁকে সমাজতাত্ত্বিক বা কম্যুনিস্ট বলে দাগিয়ে দিতে পারে না দেখেই হয়তো মানবতাবাদি বলে চিহ্নিত করেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর অধিকাংশ ছবি শুধুমাত্র নাগরিক জীবনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব যন্ত্রণা নিয়েই নির্মিত হয়নি। সদগতি থেকে শুরু করে গুপী গাইন বাঘা বাইন, হীরক রাজার দেশে, প্রতিদ্বন্দ্বী, সীমাবদ্ধ, অরণ্যের দিনরাত্রি, আগন্তুক, শাখা-প্রশাখা প্রভৃতি অধিকাংশের মধ্যেই সমাজ ও সামাজিক মানসিক যন্ত্রণা হতাশা, শাসকশ্রেণির যুদ্ধপিপাসা নির্মাণের জন্য প্রচার মাধ্যমের ওপর আধিপত্য, বিজ্ঞানমনস্কতা ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর প্রাতিষ্ঠানিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, সমস্তই সত্যজিতের চলচ্চিত্রে গভীর সামাজিক ও রাজনৈতিক বার্তা পাঠিয়েছে। সত্যজিৎ রায় জীবনের শেষ প্রান্তে যে দুটি ছবি তৈরি করেছিলেন আগন্তুক এবং গণশত্রু, সেই ছবির মূল চরিত্রের সঙ্গে খুব স্পষ্টভাবেই একাত্মবোধ অনুভব করেছেন। তিনি এক জায়গায় নিজেই বলছেন যে গণশত্রুর ডাক্তার হচ্ছেন তিনি নিজে।

ইবসেনের এ্যান এনিমি অফ দি পিপল নাটক সমকালীন বাংলার সমাজ সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম করে নেওয়া হয়েছে। ডাক্তারের প্রত্যয় এর সঙ্গে সত্যজিৎ একশ ভাগ সমদর্শী। তিনি আরো বলছেন, তিনি নিজে উৎপল দত্তের মতো একজন সংবেদনশীল দক্ষ প্রতিভাবান অভিনেতা এই চরিত্রটি করায় ভীষণ খুশি হয়েছিলেন। সত্যজিৎ কতটা রাজনৈতিক এবং সামাজিক দিক থেকে অচলায়তনের বিরোধী এবং সামাজিক পরিবর্তনকামী তিনি নিজে যাই বলুন না কেন, তাঁর সমস্ত ছবিতেই তার সাক্ষ্য মিলছে। তিনি বলছেন যে আধুনিক জীবনের ভোগ্যপণ্য মোহান্ধ জীবনচর্যায় তিনি বিশ্বাসী নন। তিনি অসন্তুষ্ট বিরক্ত ইরানের যুদ্ধ, ভিয়েতনাম, কমিউনিজম সংকট ক্ষুধা-দারিদ্র দুর্ভিক্ষ নিয়ে। সমস্ত বিষয়টি তিনি জানতে ইচ্ছুক, কিন্তু বিব্রত হতে আগ্রহী নন, একথা বললেও তিনি তাঁর চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়ে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আধুনিক শহর ভিত্তিক রাষ্ট্রচিন্তার বিরুদ্ধে এবং প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের নামে কুসংস্কার এবং অন্ধবিশ্বাস মানুষের মনে অনুপ্রবেশ করানোর রাষ্ট্রবাদী ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত বিরোধী। আগন্তুক-এর নায়ক প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ নাগরিক সভ্যতা থেকে অনেক দূরে বিভিন্ন জনজাতির জীবনযাত্রার সঙ্গে অন্বিত থেকেছেন। তিনি লক্ষ করেছেন বিভিন্ন জনজাতি মানুষের মাংস খেলেও সাম্রাজ্যবাদী সভ্য দুনিয়ার রাষ্ট্রশক্তি, যারা পারমাণবিক বোমা ফেলে এবং কাঁটাতারের বেড়া তৈরি করে দেশে দেশে গণহত্যা করে তারা তথাকথিত সভ্য জগতের নাগরিকদের তুলনায় প্রকৃতপক্ষে সমবায় বোধে ঋদ্ধ জীবনযাত্রার প্রেক্ষিতে অনেক বেশি উন্নততর প্রকৃত শুদ্ধ সভ্য মানুষ। এই ভদ্রলোক শিল্প সম্বন্ধে আগ্রহী হতে হতে একদিন লাতিন আমেরিকার আদিবাসী জীবনের সঙ্গে পরিচিত হলেন একটি গুহায় বাইসনের ছবি দেখে। এই ছবির মাধ্যমে আদিম সাম্যবাদী জীবন যাত্রার প্রতি আকৃষ্ট নৃতত্ত্ববিদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে সত্যজিৎ রায় তথাকথিত ভোগ্যপণ্যে অভ্যস্ত সভ্য সমাজের বিপরীতে আদিবাসী সমাজের যে চিত্র আঁকেন, তা যে অপেক্ষাকৃতভাবে সভ্য এবং সভ্যতার শব্দটি যে কত আপেক্ষিক তার প্রবক্তা রূপে আগন্তুক চলচ্চিত্রটি বার্তা পাঠায়। সরল সামবায়িক তথা মানবিক জীবনের সঙ্গে তথাকথিত জটিল নাগরিক জীবনের সংঘাত সত্যজিতের জীবনের আগ্রহের বিষয়। বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির তথাকথিত উন্নয়ন যদি শুধুমাত্র ভোগের জন্য নাগরিক জীবনচর্যার মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায় তবে সত্যজিতের সঙ্গে সেই জীবনের অনন্বয় ঘটে। এদিক থেকে তিনি সহজ-সরল সামাজিক একাংশে জীবনে রবীন্দ্রনাথ এবং মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর অনুসারী। তাই বলে সত্যজিৎ কিন্তু কখনো বিজ্ঞান যখন যুক্তির ভিত্তিতে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার সামাজিক অপশক্তি হয়ে সভ্যতার কলঙ্কিত করার চক্রান্তের প্রতিবাদী হয়ে দাঁড়ায়, তার সপক্ষে কখনো ঋজু মেরুদণ্ডসহ প্রতিবাদ করতে পিছপা হননি। দেবী এবং গণশত্রু চলচ্চিত্রে বিজ্ঞান এবং ধর্মের মধ্যে সংঘাত এ সত্যজিৎ প্রতিবাদী ভূমিকা নিয়েছেন। তাই নিজেই বলেছেন আগন্তুকের নায়ক আর গণশত্রুর নায়ক প্রকৃতপক্ষে তিনি নিজে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপুর তিনটি পর্বে ভারতীয় চলচ্চিত্র একাধারে মৌলিক আন্তর্জাতিক ধারা প্রতিষ্ঠা করতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে মহান শিল্পী সত্যজিতের প্রতিভাও নতুন নতুন দিগন্তে প্রসারিত হতে শুরু করে। অপু ত্রয়ী আসলে কলোনিয়াল সাংস্কৃতিক সামাজিক সুপার স্ট্রাকচারের গর্ভে যে বাঙালি মধবিত্তভিত্তিক রেনেসাঁর উন্মেষ হয়েছে তা নাগরিক সমাজের প্রান্তবাসী দরিদ্র শিক্ষিত জীবনেও আছড়ে পড়ে। জীবনের কঠিনতম বাস্তবতা, স্বজন বিরহ বিয়োগ নব উদ্ভাসিত রেনেসাঁর সঙ্গে সংঘাতে মিলনে অপু ত্রয়ী বিংশ শতকের প্রথম ভাগের কাহিনী হয়েও সমকালকে অতিক্রম করে মহৎ সৃষ্টিতে উন্নীত হয়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই উৎক্রমণের প্রেরণাঋদ্ধ রচনা সত্যজিতকে ঊনবিংশ থেকে বিংশ শতকব্যাপী রেনেসাঁর শেষ যুগপুরুষ রবীন্দ্রনাথের পথরেখায় চলার দায়বদ্ধতা জোগায়। সত্যজিৎ রায় খুব সুস্পষ্টভাবে কোনো সাক্ষাৎকারে তাঁর নিজস্ব রাজনৈতিক চিন্তা সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ না করলেও তাঁর শিল্পকর্মের মধ্যে দিয়ে ক্ষুধা দুর্ভিক্ষ এবং মহামারী সৃষ্টির পিছনে কাদের হাত তাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন তাঁর ফ্যান্টাসি গুপী গাইন বাঘা বাইন এবং হীরক রাজার দেশেতে। আরো স্পষ্টভাবে তেতাল্লিশ-এর দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে চোরাকারবারীর ছবি এবং কলোনিয়াল শাসকের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় কিভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষ গ্রাম থেকে শহরমুখী হয়েছিল তা আরও চূড়ান্ত করুণ ছবি এঁকেছেন অশনি সংকেতে। দরিদ্র গুপী বাঘা শুরুতেই ভূতের রাজার কাছে খাদ্য পোশাক এবং যেখানে খুশি যাওয়ার বর অধিকার হিসেবে প্রত্যাশা

এরপর ৮ পাতায়

চটশিল্পের ইউনিয়নগুলির যৌথ আহ্বানে রাজ্য কনভেনশন

গত ২৩ মে ২০২২ শ্রমিক ভবনে (বঙ্কিম মুখার্জী হল) চটশিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একুশটি ট্রেড ইউনিয়নের উদ্যোগে বন্ধ চটকল খোলা সহ চটশিল্পের শ্রমিক কর্মচারীদের ২৬০০০ টাকা ন্যূনতম মজুরির দাবি, দৈনিক মজুরিতে অস্থায়ী কর্মচারী নিয়োগের প্রতিবাদ ইত্যাদি ২২ দফা দাবির ভিত্তিতে শ্রমিক কর্মচারীদের দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম গড়ে তোলার লক্ষ্যে রাজ্য কনভেনশন সংগঠিত করা হয়।

কনভেনশনে উত্থাপিত প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয় যে এবার যথেষ্ট কাঁচা পাট উৎপাদন হওয়া সত্ত্বেও কারখানাগুলিতে একশ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ীদের মজুতদারি কালোবাজারি এবং রাজ্য সহ কেন্দ্রীয় সরকারের নিস্পৃহতার জন্য কাঁচামালের কৃত্রিম সঙ্কটে ১৪।১৫টি চটকল বন্ধ হয়ে যায়।

এই পরিস্থিতির মোকাবিলায় গত ১৩ জানুয়ারি ২০২২ চটকলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ট্রেড ইউনিয়নগুলির পক্ষ থেকে কেন্দ্রের বস্ত্রমন্ত্রী, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং জুট কমিশনার, ডিরেক্টর জে সি আই, ডি জি এনফোর্সমেন্ট প্রভৃতির কাছে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দাবি রাখা হয়। জুট কমিশনার এবং ডিরেক্টর জে সি আই ট্রেড ইউনিয়নগুলির সঙ্গে যুক্ত সভা আহ্বান করা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত কাঁচাপাট সংগ্রহের কোনো ব্যবস্থাই রাজ্য সরকারের তরফ থেকে করা হয়নি।

শেষ পর্যন্ত আন্দোলনের চাপে সরকারি দাম ও বাজার দরের মধ্যে যেটা বেশি হবে সেই দামে পাটচাষিদের থেকে জে সি আই-এর মাধ্যমে কাঁচাপাট সরবরাহ করার সিদ্ধান্ত মেনে নেয় জে সি আই কর্তৃপক্ষ।

ইতিপূর্বে দীর্ঘদিন ধরে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি ভঙ্গ করে শ্রমিক কর্মচারীদের গ্র্যাচুইটি, পি এফ, ই এস আই এর বকেয়া টাকা না দেওয়া, ৯০ : ২০ চুক্তি মেনে না নেওয়া ইত্যাদি বিষয় নিয়ে গভীর সঙ্কট তৈরি হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন করে চটশিল্পের শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও দাবি মানার জন্য সরকারকে বাধ্য করার জন্য শ্রমিক আন্দোলন সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এই সভা পরিচালনার জন্য সভাপতিমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য ছিলেন ইউ টি ইউ সি'র রাজ্য সম্পাদক কম. দীপক সাহা। বি পি সি এম ইউ'র পক্ষে বক্তব্য রাখেন কম. দীপক সাহা। এই কনভেনশনে একুশটি ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষ থেকে জুন মাসব্যাপী প্রতিটি জেলায় কনভেনশন সংগঠিত করার কর্মসূচি গৃহীত হয়। প্রতিটি চটকলের গেটে গেট মিটিং ও মিছিল সংগঠিত করতে হবে।

ত্রিপুরায় রাজ্য যুব কনভেনশন

গত ২৯ মে, রবিবার দুপুর ২টায় আগরতলা মেলার মাঠ আর এস পি রাজ্য দপ্তরের হলঘরে অনুষ্ঠিত হয় আর ওয়াই এফ ত্রিপুরা রাজ্য যুব কনভেনশন। কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন কম. তুতিউর রহমান। কনভেনশনে সদর, উদয়পুর, পানিসাগর, ধর্মনগর সহ বিভিন্ন মহকুমার প্রতিনিধিগণ উপস্থিত হন। কনভেনশনে উপস্থিত থাকেন আর এস পি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, ত্রিপুরা রাজ্য ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক কম. দীপক দেব। আর এস পি-র রাজ্য কমিটির সদস্য গোমতী জেলা সম্পাদক কম. ভানু লোধ এবং আর ওয়াই এফ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কম. শ্রীকান্ত দত্ত।

কনভেনশনে বক্তারা তাঁদের আলোচনায় বলেন যে, দেশ আজ চরম আর্থসামাজিক সংকটের মুহূর্তে দাঁড়িয়ে। বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনে বেকাররা আজ দিশেহারা, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি আজ আকাশছোঁয়া। দেশি বিদেশি কর্পোরেট কোম্পানির স্বার্থে দেশের সম্পদ লুঠের সুযোগ করে দিয়েছে মোদী সরকার। ভারতের শ্রমজীবী মেহনতী মানুষ সহ সাধারণ জনগণকে এই সংকট থেকে পরিত্রাণ দিতে পারে একমাত্র দেশের খেটে খাওয়া মানুষের পাশে থেকে যুবশক্তি। ত্রিপুরা রাজ্যেও শাসনক্ষমতায় বিজেপি পরিচালিত সরকার। রাজ্যে গত সাড়ে চার বছরের বিজেপি শাসনে বেকার সমস্যা চরম দুরপনেয় এক ব্যাধি। গরিব মেহনতি মানুষের অবস্থা খুব করুণ। রাজ্যবাসী এই দমবন্ধ অবস্থায় দাঁড়িয়ে। রাজ্য সরকার তথা বিজেপি দলের প্রতি রাজ্যবাসী প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ। কিন্তু তাদের ফ্যাসিস্ট শাসনে জনগণের মত প্রকাশের স্বাধীনতাও নেই। বিজেপি দল এখন হেলমেট পরিহিত বাইক বাহিনীকে ব্যবহার করে রাজ্য চালাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের মতো এরাজ্যও কার্যত দুর্বৃত্তশাসিত সাধারণ মানুষের বধ্যভূমি। রাজ্যের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার করুণ দশা। এককথায় ২০১৮ সালে যে 'ভিশন ডকুমেন্ট' ঘোষণা করে, লোভনীয় পরিষেবার কথা বলে বিজেপি সরকারএসেছিল আজ সাড়ে চার বছরে এরা ত্রিপুরাকে শ্মশানে পরিণত করেছে।

রাজ্যের প্রতিটি যুবক যুবতীর কাছে আর ওয়াই এফ-এর কর্মী নেতৃত্বগণকে যেতে হবে। তাঁদের সংঘবদ্ধ করে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে রাজ্য থেকে ফ্যাসিস্ট সরকারকে উচ্ছেদ করতে হবে।

কনভেনশনে রাজ্য ভিত্তিক একটি প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়। প্রস্তুতি কমিটির সম্পাদক হন কম. শ্রীকান্ত দত্ত।

আর এস পি'র মিছিল

সেদিনই বিকাল ৪টায় আর এস পি'র উদ্যোগে কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতি, লাগামহীন বেকারসমস্যা, আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদ জানিয়ে এক প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হয় আগরতলা মেলার মাঠ আর এস পি রাজ্য দপ্তরের সামনে থেকে, মিছিলে নেতৃত্ব দেন আর এস পি রাজ্য কমিটির সদস্য, প্রাক্তন মন্ত্রী কম. জয়গোবিন্দ দেবরায়, আর এস পি'র কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক ও ভারপ্রাপ্ত রাজ্য সম্পাদক কম. দীপক দেব রাজ্য কমিটির সদস্য কম. ভানু লোধ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

উদয়পুরে বামফ্রন্টের সভা

গত ৩০ মে বিকাল ৪টেয় ত্রিপুরা রাজ্যের উদয়পুরে বামফ্রন্টভুক্ত ৪টি বামপন্থী দলের ডাকে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য ও পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি, বেকার সমস্যা সহ পাঁচ দফা দাবির ভিত্তিতে এক পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। পথসভায় সভাপতিত্ব করেন কম. শ্রীকান্ত দত্ত, কম. অরবিন্দ নন্দী। বক্তব্য রাখেন আর এস পি'র জেলা সম্পাদক কম. ভানু লোধ, সিপিআই এম রাজ্য কমিটির সদস্য কম. রতন ভৌমিক, কম. মাধব সাহা, সি পি আই (এম এল) লিবারেশনের কম. পার্থ কর্মকার। বক্তারা বলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতি ও সিদ্ধান্তের ফলে রাজ্যবাসী চরম আর্থ সামাজিক সংকটের মধ্য দিয়ে দিনযাপন করছে। এই অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, সীমাহীন বেকার সমস্যা সর্বস্তরে শাসক দলের দুর্নীতি এবং অনুন্নয়ন সহ বিভিন্ন সমস্যা থাকা সত্ত্বেও রাজ্যবাসী আজ স্বাধীন মতামত প্রকাশ করতে পারছে না। বিজেপি পরিচালিত দুর্বৃত্তেরা হেলমেট পরিহিত বাইক বাহিনী নিয়ে জনগণকে সন্ত্রস্ত করে রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু রাজ্যের জনগণ ধীরে ধীরে সন্ত্রাসের বাধা অতিক্রম করে এই সরকারের বিরুদ্ধে রাস্তায় নামছে। তাদের সংঘবদ্ধ করে রাজ্যের ২০২৩ সালের গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে বামফ্রন্ট সরকারকে পুনরায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে হবে। রাজ্যের আপামর জনগণের কাছে বক্তারা আবেদন রাখেন যে রাজ্যবাসীকে আরও অধিকতর সংখ্যায় এই সংগ্রামে সামিল হয়ে এই দুরপনেয় অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য দীর্ঘস্থায়ী শ্রেণি আন্দোলন এবং গণ আন্দোলন সংগঠিত করতে হবে।

হুগলি জেলার উপকৃষি অধিকর্তাকে প্রতিটি ফসলের এম এস পি এবং পাঁচ দফা দাবিতে ডেপুটেশন

বাজারে খাদ্যশস্য অগ্নিমূল্য, অথচ কৃষকরা ফসলের দাম পাচ্ছেন না। ধান চাষে খরচ বস্তা পিছু (৬০ কেজিতে এক বস্তা হিসেবে) ১০০০ টাকা বা কেজি প্রতি ২২ টাকার বেশি। এর ওপর রয়েছে ঋণের সুদ। ভাগ/চুক্তি/ভাড়া বা বন্ধক নিয়ে চাষ করা চাষির খরচ আরও বেশি। দাম মিলছে গড়ে বস্তা পিছু ১১০০ টাকা বা কেজি প্রতি ১৮ টাকার সামান্য বেশি। ধানের মান খারাপ হলে দাম আরও কম। বস্তা পিছু ১২০০ টাকা দাম খুব কম কৃষকই পাচ্ছেন।

পেঁয়াজ অনেকে ৬-৮ টাকা কেজি দরে বিক্রি করেছেন, লঙ্কার দর অনেক জায়গায় ১০-১২ টাকা কেজি। কৃষকের দুরবস্থার সুযোগে বন্ধুর ছদ্মবেশে আসরে হাজির কর্পোরেট দানবেরা।

ভাগ/চুক্তি/ভাড়া/জমি বন্ধক নিয়ে বা খাস জমিতে চাষ করা পাট্টাহীন কৃষক নিয়ম ও নথির জটিলতায় সরকারি সুযোগ থেকে বঞ্চিত।

বিমা থাকা সত্ত্বেও আলুর ক্ষতিপূরণ অনেক কৃষক পাচ্ছেন না। ক্রপ হেলথ ফ্যাক্টর, যার নিরিখে বিমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণ দেয়, তার পদ্ধতিতেই ত্রুটি রয়েছে। ক্ষেত্র সমীক্ষা করে ক্ষতির পরিমাণ ঠিক করা হয় না। রাজ্য সরকারও জাওয়াদের ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করে নি। নিম্নোলিখিত দাবিতে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

১) প্রতিটি ফসল ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে সরকারকে কৃষকের থেকে সরাসরি কিনতে হবে। ফড়ে রাজ খতম করতে প্রতিটি পঞ্চায়েতে সরকারি ক্রয়কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে ও নিয়মের জটিলতায় কৃষকরা ফসল সরাসরি বিক্রিতে যাতে বঞ্চিত না হন, তা সুনিশ্চিত করতে হবে। ২) ভাগ, চুক্তি, লিজ বা খাস জমিতে চাষ করা পাট্টাহীন কৃষকদের নিয়মের জটিলতায় সরকারি প্রকল্প, বিমা, ক্ষতিপূরণ বা ঋণ থেকে বঞ্চিত করা চলবে না। জমির নথিকেই প্রামাণ্য গণ্য না করে, প্রকৃত কৃষকদের চিহ্নিত করতে ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে হবে। ৩) আলু চাষিদের ক্ষতিপূরণ নিয়ে সমস্যার সমাধানে কৃষি দপ্তরকে সক্রিয় হতে হবে। ৪) কৃষকদের কাছে কৃষি উপকরণ বিতরণে স্বচ্ছতা সুনিশ্চিত করতে হবে। ৫) কৃষকদের দুরবস্থার সুযোগে কৃষিক্ষেত্রে কর্পোরেট হানাদারি রুখতে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

ধান চাষে এই মরশুমে ক্ষতির কিছু নমুনা ব্লক বলাগড়, গ্রাম পঞ্চায়েত কৃষ্ণবাটিচর অঞ্চলের নিম্নরূপ :—

● কমল রায়ের ২ বিঘা খাস জমিতে ধান চাষে বিঘে প্রতি খরচ ১৮,৮০০ টাকা। ফলন হয়েছে বিঘে প্রতি ১১ বস্তা। ধানকাটার সময়ে বৃষ্টিতে ফসল কমেছে, মান খারাপ। তারমধ্যে মহাজনের কাছে ২০,০০০ টাকা ধার। তাকেই ধান বেচতে গেলে দাম পাবেন বস্তাপিছু ১০০০-১০৫০ টাকা। অর্থাৎ বিঘে প্রতি লোকসান হবে প্রায় ৮০০০ টাকা। খাস জমির পাট্টা না থাকায় তিনি সরকারি সুযোগ পান না।

● এই পঞ্চায়েতের বাদল বিশ্বাস নিজের ৫ বিঘা জমিতে ধান চাষ করেছেন। বিঘে প্রতি খরচ হয়েছে ২০,৯২০ টাকা। ধান কাটার সময়ে বৃষ্টিতে ফলন ও মান দুই কমেছে। ফলন হয়েছে বিঘে প্রতি ১০ বস্তা। এখন বিক্রি করলে এই ধানের দাম পাবেন বস্তা প্রতি ১০০০ টাকা। ভালো মানের ধান হলে এখন পাওয়া যাচ্ছে বস্তা প্রতি ১২০০-১২২০ টাকা। (এখানে আবার নতুন ধান তোলার সময় ৬২ কেজিতে এক বস্তা ধরা হয়, সেক্ষেত্রে ক্ষতি আরও বেশি)

● ব্লক চণ্ডীতলা ১, পঞ্চায়েত কৃষ্ণরামপুর সুশান্ত দাস অন্যের দেড় বিঘা জমিতে চুক্তিতে ধান চাষ করেছেন। বিঘে প্রতি খরচ হয়েছে প্রায় ১২০০০ টাকা। (১০ ঃ ২৬ ঃ ২৬ সার না কিনে পটাশ, ফসফেট, ইউরিয়া ২ ঃ ৫ ঃ ২ অনুপাতে মিশিয়ে নেওয়াতে সারের খরচ কম হয়েছে।) চুক্তি অনুসারে জমি মালিককে বিঘে প্রতি ২ বস্তা হিসেবে আর্থিক মূল্য ২২০০ টাকা। অর্থাৎ খরচ বিঘে প্রতি ১৪০০০ টাকার বেশি। ফলন কম হয়েছে। বিঘে প্রতি ৫৬০ কেজি বা ৯ বস্তার সামান্য বেশি। অর্থাৎ বস্তা প্রতি খরচ প্রায় ১৫০০ টাকা। ধানের দাম যাচ্ছে বস্তা প্রতি ১১০০ টাকা।

খানাকুল ১ ব্লকের রামমোহন ২ অঞ্চলে বিঘে প্রতি খরচ ১৫০০০-১৬০০০ টাকা। ভাগ, ভাড়া, চুক্তি চাষিদের আরো বেশি। এখানে সেচ বাবদ নগদ অর্থ না দিয়ে ফসলের ভাগ দেওয়ার রীতিও আছে। উৎপাদিত ফসলের চার ভাগের এক ভাগ মিনির মালিককে দেওয়া হয়। এখানে এবারে বিঘে প্রতি ধানের গড় ফলন ১২ বস্তা। বস্তা পিছু গড় খরচ ১২৫০-১৩৩০ টাকা। সেচ বাবদ ৩ বস্তা ধান দিতে হলে কৃষকের হাতে থাকবে ৯ বস্তা ধান। আবার ভাগ চাষিকে চার ভাগের এক ভাগ জমি মালিককে দিতে হলে থাকবে ৬ বস্তা (মোট ফসলের অর্ধেক)। ধানের দাম এখন যাচ্ছে বস্তা পিছু ১০৫০-১১০০ টাকা।

আলু চাষিদের ক্ষতিপূরণ নিয়েও চলছে বঞ্চনা। রাজ্য সরকার জাওয়াদের ক্ষতিতে শস্যবিমা করেনি। করেছে দ্বিতীয় বার বসানো আলু গাছে। তাই ডিসেম্বরে জাওয়াদে বিপুল ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা নিয়ে জটিলতা। বিমা কোম্পানি কয়েক বছরের ফসল উৎপাদনের ভিত্তিতে ক্রপ হেলথ ফ্যাক্টর নির্ধারণ করে। তার নিরিখে ক্ষতির পরিমাপ হয়। এটা করা হয় পঞ্চায়েত ভিত্তিতে, ব্যক্তির ভিত্তিতে নয়। ফলে, একই পঞ্চায়েতের দুইজন কৃষকের ক্ষতি এক না হলেও, ক্ষতিপূরণ একই হবে। আবার পাশের পঞ্চায়েতে একজন কৃষকের ক্ষতি হলেও তিনি বিমার অর্থ পাবেন না। আবার ধারাবাহিকভাবে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ফলন কম হতে থাকলে সেটাই স্টান্ডার্ড হয়ে যাবে। তাহলে ক্ষতির সরকারি স্বীকৃতিও মিলবে না।

১৪-১৫ মে ২০২২ নিখিল বঙ্গ মহিলা সংঘের রাজ্য কাউন্সিল

গত ১৪-১৫ মে কলকাতার লোকায়ত সভাগৃহে নিখিলবঙ্গ মহিলা সংঘের রাজ্য কাউন্সিল সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হলো। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রতিনিধিবৃন্দ এই কাউন্সিলে উপস্থিত হয়। শহীদ বেদীতে মাল্যদান ও সংগঠনের পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে সভার কর্মসূচি শুরু হয়। সভার শুরুতে সংগঠনের রাজ্য সভাপতি কম. সুচেতা বিশ্বাস ও সহ-সভানেত্রী কম. শ্যামলিমা সরকার ও কম. ছায়া রায়কে নিয়ে সভাপতিমণ্ডলী গঠিত হয়। সভার শুরুতে সভানেত্রী বলেন আজকের দিনে মহিলা সংগঠন করার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম অত্যন্ত গুরুত্ববাহী। সমাজের অর্ধেক মহিলা, কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে তারা অবর্ণনীয় নিপীড়ন বঞ্চনার শিকার।

অতিমারী সময়কালে মহিলাদের উপর সেই আক্রমণ আরো বেড়েছে। জীবিকার সংস্থান হারিয়ে যাওয়া, বেকারত্ব, ক্ষুধা, সমান কাজে সমাজ মজুরি না পাওয়া, দারিদ্র্য, অপুষ্টির দাপটে এক দুর্বিষহ অবস্থার মধ্য দিয়ে তারা চলেছে। প্রতিদিন পেট্রোলের মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে, রান্নার গ্যাসের দাম বাড়ছে, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের আকাশ ছোঁয়ামূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে। এই অবস্থায় মহিলারাই সবচেয়ে অসহায়তার শিকার। আর সেই গরিব খেটে-খাওয়া মহিলারাই আমাদের সংগঠনের মূল শক্তি। বর্তমানে যে অবস্থায় গিয়ে সমাজ দাঁড়িয়েছে, রাজ্য ও দেশের যা অবস্থা সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে ঘরে এবং বাইরে সর্বত্রই মহিলারা সবচেয়ে বেশি নির্যাতনের শিকার। বেকারত্ব দারিদ্র্য এবং হাহাকার সর্বত্র তাদের আষ্টেপৃষ্টে ঘিরে ধরেছে।

এমন এক জটিল অবস্থায় দাঁড়িয়ে সংগঠন করা বেশ কঠিন কাজ। কিন্তু তবু আমরা যারা সমাজবদলের স্বপ্ন দেখি তাদের, এই কঠিন কাজকে নিয়ে এলাকায়, এলাকায়, অঞ্চলে, অঞ্চলে গ্রামীণ ও ব্লক স্তরে আরো বেশি সংগঠিত হতে হবে ও সংগঠনের পতাকা তুলে ধরতে হবে।

১৫ তারিখ দ্বিতীয় দিন কাউন্সিল অধিবেশনের শুরুতে বক্তব্য রাখেন আর এস পি'র সাধারণ সম্পাদক কম. মনোজ ভট্টাচার্য। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন বর্তমান সময়ে সংগঠন করা কঠিন এটা ঠিকই তবে, সংগঠন করার ধারণা পাল্টাতে হবে। মনে রাখতে হবে আমরা যে, দর্শনের বিশ্বাস করি তা বস্তুবাদী দর্শন। ভাববাদের এখানে কোনো স্থান নেই। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা তাদের সংকীর্ণ স্বার্থে বিজ্ঞান ভাবনার প্রসার ঘটাতে দেয় না। মানুষ যত কুসংস্কারগ্রস্থ হবে ততই তাদের সুবিধা।

মহিলাদের একটা ব্যাপক অংশ অন্ধ কুসংস্কার দ্বারা প্রভাবিত। আর এস এস দ্বারা প্রভাবিত বিজেপি সরকার মনুবাদে বিশ্বাসী-তারা মেয়েদের অন্ধকার যুগে নিয়ে যেতে চায়। আবদ্ধ করে রাখতে পারলে তাদের উদ্দেশ্য পূরণ সহজ হয়। কারণ মানুষ তাহলে তার মূল সমস্যা বেকারত্ব, দারিদ্র্য, অশিক্ষার বিরুদ্ধে আন্দোলনে সে একত্রিত হতে পারবে না। না হতে পারলেই শোষণের পথ সুগম হবে। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে মহিলাদের অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে।

কম. ভট্টাচার্য আরও বলেন, সাধারণ মহিলাদের কাছে সংস্কারমুক্ত জীবনের বার্তা বয়ে নিয়ে যেতে হবে। একইসঙ্গে মহিলাদের সতর্ক করে দিয়ে তিনি বলেন, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের আমলে জীবন-জীবিকা যত সংকটগ্রস্ত হচ্ছে ততই সে সাম্প্রদায়িক ও বিভেদ মূলক শক্তির বৃদ্ধি ঘটাতে উগ্রভাবে সাম্প্রদায়িক শক্তি বৃদ্ধির হিন্দুস্থান বানাতে উগ্র ভূমিকা নিচ্ছে। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের সংজ্ঞা এর বিরুদ্ধে আন্দোলন ছাড়া অন্য কোনো গত্যন্তর নেই। মহিলাদের সে ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিতেই হবে।

রাজ্য কাউন্সিলের প্রথম দিনে একটি মিছিল সংঘটিত করা হয়। রিপন স্ট্রিট থেকে মৌলালী পর্যন্ত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, ক্রমবর্ধমান নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে এক সুসজ্জিত মিছিল হয় যা স্থানীয় জনমানসে ব্যাপক প্রভাব ফেলে।

অধিবেশনে আর এস পি কলকাতা জেলা সম্পাদক কম. দেবাশিস মুখার্জী প্রতিনিধিদের অভিনন্দন জানিয়ে বর্তমান সময়ে মহিলা আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে ব্যাখ্যা করেন। এছাড়া এই সভায় বক্তব্য রাখেন আর ওয়াই এফ-এর সর্বভারতীয় সম্পাদক কম. রাজীব ব্যানার্জি ও প্রগ্রেসিভ স্টুডেন্টস ইউনিয়নের সর্বভারতীয় সম্পাদক কম. মহম্মদ নওফেল সফিউল্লাহ।

দু'দিনের এই কাউন্সিলের সভায় মাইক্রোফিনান্স-এর মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বিশেষভাবে একটি হৃদয়স্পর্শী আলোচনা করেন আর এস পি'র হুগলি জেলা কমিটির সম্পাদক ও রাজ্য কমিটির সদস্য কম. মৃন্ময় সেনগুপ্ত। তিনি কীভাবে মাইক্রোফিনান্স-এর লোন দেওয়ার নামে ধার/কিস্তি বাকি থাকলে কিভাবে মহিলাদের ওপর আক্রমণ হচ্ছে বা তাঁদের হেনস্থা করা হচ্ছে তা বিশদে বিবৃত করেন। তিনি বলেন, সব মিলিয়ে একদিকে চাষের ক্ষতি অন্যদিকে ধার শোধ না করতে পারার ফলে পারিবারিক অশান্তি ও গার্হস্থ্য হিংসা বাড়ছে।

দু'দিনের এই কাউন্সিল অধিবেশনে প্রায় ২৫ জন প্রতিনিধি বক্তব্য রাখেন। বিভিন্ন জেলা প্রতিনিধিরা জেলার সমস্যা ও মহিলা সংগঠনের করণীয় বিষয় নিয়ে বক্তব্য রাখেন। সভার শুরুতে ফোয়ারা দত্ত ও সুরাইয়া খাতুন গণসংগীত পরিবেশন করেন। কাউন্সিল অধিবেশনে কবিতা পাঠ করেন রমা ঘোষ ও সুরাইয়া খাতুন।

রাজ্য কাউন্সিল সভার উদ্বোধন করে আর এস পি'র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কম. বিশ্বনাথ চৌধুরী তাঁর ভাষণে বলেন, যে গত দু'বছর অতিমারীর কারণে এক অভূতপূর্ব সংকটজনক পরিস্থিতির মুখোমুখি সারা পৃথিবীর মানুষ, আমাদের রাজ্য তার বাইরে নয়। বেকারত্ব, দারিদ্র্য, মূল্যবৃদ্ধি, মানুষকে এমন অবস্থায় ফেলেছে যা দুর্বিষহ। এই পরিস্থিতিতে মহিলাদের অবস্থা আরও কঠিন। একই সঙ্গে ঘরে বাইরে সামলাতে তারা হিমশিম খাচ্ছে। অন্যদিকে একই সঙ্গে প্রতিনিয়ত নাবালিকা মহিলারা পর্যন্ত পৃথিবীজুড়ে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। আর আমাদের রাজ্যের অবস্থা অবর্ণনীয়। মেয়েরা শুধু ধর্ষণের শিকারই হচ্ছে না, একইসঙ্গে ধর্ষণ এবং খুন উভয়ই হচ্ছে। এমন ভয়ঙ্কর অবস্থার মুখোমুখি এ রাজ্য কখনো হয়নি। কোনো রকম আইন-কানুন রাজ্যে নেই, সন্ত্রাসের রাজত্ব চলছে। শুধুমাত্র অনুদান দিয়ে মানুষকে ভুলিয়ে রাখা হচ্ছে। চাকরি বা জীবনের সমস্যা সমাধানে সরকার আগ্রহী না। এই জনবিরোধী সরকারের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন গড়ে তোলা জরুরি। নিখিল বঙ্গ মহিলা সংঘের কাউন্সিল এই উদ্যোগ আরো বেশি বেশি করে গ্রহণ করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

নিখিলবঙ্গ মহিলা সংঘের রাজ্য সম্পাদিকা কম. সর্বানী ভট্টাচার্য রাজনৈতিক এবং সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করেন। তিনি বলেন, বর্তমান আর্থসামাজিক পরিস্থিতিতে এবং অতিমারীর সময়কালের মহিলারা পৃথিবীজুড়ে বৈষম্যের মুখোমুখি হয়েছে সবচেয়ে বেশি। তিনি মহিলাদের অবস্থান ও সংগঠনের করণীয় কাজ সম্পর্কে মহিলাদের কর্তব্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন উদারীকরণ ও পিতৃতন্ত্র গাঁটছড়া বাঁধা। নারী নির্যাতন এই সমাজব্যবস্থায় শ্রেণিশোষণের একটা রূপ মাত্র। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়তে চাই লাগাতার কর্মসূচি। আমাদের সংগ্রাম পরিব্যাপ্ত করতে একইসঙ্গে চাই বাম মহিলা শক্তিগুলোর ঐক্যবদ্ধ মঞ্চ। এই দুইয়ের মধ্যে দিয়ে সমস্ত বিচ্যুতির বিরুদ্ধে ধারাবাহিক ও আপসহীন গণ আন্দোলনের তীব্রতা আরও বৃদ্ধি করতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। সাধারণ মহিলাদের মধ্যে ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে নারী সমাজকে সংগঠনের আরও ঘনিষ্ঠ করে তুলতেই হবে।

ডুয়ার্স চা বাগান ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের ৩৩তম সম্মেলন

বীরপাড়া, ২৯ মে : চা বাগানের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি চালুর বিষয়ে গড়িমসি করছে সরকার। ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত ডুয়ার্স চা বাগান ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের ৩৩তম কেন্দ্রীয় সম্মেলনে এই অভিযোগ উঠল।

রবিবার আলিপুরদুয়ার জেলার বীরপাড়ায় এই সম্মেলন শুরুর আগে ৩১টি চা বাগান থেকে আগত প্রতিনিধিদের একটি মিছিল বীরপাড়া পরিক্রমা করে। উপস্থিত ছিলেন ইউ টি ইউ সি'র রাজ্য সম্পাদক দীপক সাহা, সভাপতি তথা আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল দাস, তাছাড়া কম. গোপাল প্রধান, কম. জন ফিলিপ খালকো, কম. কিশোর মিঞ্চ, কম. কিশোর রোহান প্রমুখ চা বাগানের শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ। প্রতিনিধি সভায় অংশ নেন ২০৩ জন। ন্যূনতম মজুরি সুনিশ্চিত করা, চা বাগানের জমিতে শ্রমিকদের পাট্টা প্রদান, শ্রমিকদের অবসরের বয়সের সীমা ৫৮ বছর থেকে বাড়িয়ে ৬০ বছর করার দাবি ওঠে সম্মেলনে। বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আর এস পি'র আলিপুরদুয়ার জেলা কমিটির সম্পাদক সুনীল বণিক। ২০১৫ সাল থেকে ওই সংগঠনের বেশ কিছু দাবি নিয়ে আলোচনা হয়।

এদিন ৫১ জনের নয়া কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন হয়। সভাপতি ও কার্যনির্বাহী সভাপতি মনোনীত হয়েছেন যথাক্রমে মনোহর তিরকি ও কার্যকরী সভাপতি হয়েছেন জন ফিলিপ খালকো।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক গোপাল প্রধানের অভিযোগ, রাজ্য সরকারের শ্রমমন্ত্রী ন্যূনতম মজুরি চালুর ব্যাপারে যে আশ্বাস দিয়েছিলেন তা পূরণ হয়নি। জয়েন্ট ফোরামের নেতৃত্বে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত ডুয়ার্স চা বাগান ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন।

আর্থিক বৃদ্ধিতে সুদ বৃদ্ধির ধাক্কা

বিক্রি নেই অতএব শিল্পপতিদেরও নতুন লগ্নিতে উৎসাহ নেই। এমতাবস্থায় মূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে রাখতে RBI আচমকা সুদের হার বাড়ানোয় আর্থিক বৃদ্ধি ধাক্কা খাবে।তা বলে তো মোদী-শাহের রাজ্যে আসন্ন নির্বাচনের প্রেক্ষিতে মূল্য বৃদ্ধিকে অস্ত্র হিসাবে বিরোধীদের হাতে তুলে দেওয়া যায় না। যেন তেন প্রকারেন ক্ষমতায় টিকে থাকাটাই বড় কথা। তাই আর্থিক বৃদ্ধির উপর নেতিবাচক প্রভাবের আশঙ্কা সত্ত্বেও RBI সুদ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর ফলে, অবধারিত ভাবেই কোভিডের গ্রাস থেকে অর্থনীতির ঘুরে দাঁড়ানোর প্রক্রিয়া মার খেতে বসেছে। অর্থনীতিকে চাঙ্গা করানোর জন্য সরকারের শুধু ঋণের জোগান বাড়ানোই নয়, ক্রয় ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য মানুষের হাতে নগদ টাকা তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করাটাও প্রয়োজন। শুধু সুদের হার বাড়ানো হল, অথচ বাজারে নগদের জোগান কমলে সরকারি দাওয়াই কতটা কাজ করবে বলা মুস্কিল।

মে মাস ব্যাপী আন্দোলনের পথে নদীয়া জেলা আরএসপি

শ্রমিক শ্রেণির রক্তে রাঙানো মে দিবস পালন সহ সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার যে মানুষ মারা নীতি নিয়ে চলেছে তার বিরুদ্ধে আরএসপি ও শ্রমিক ফ্রন্ট ইউ টি ইউ সি নদীয়া জেলা কমিটির উদ্যোগে কৃষ্ণনগর, রাণাঘাট, কল্যাণী লোকাল সহ জেলার বিভিন্ন লোকালে মিছিল ও বিক্ষোভ সভার আয়োজন করা হয়।

১ মে নদীয়া জেলার সর্বত্র মহান মে দিবস পালন করা হয় রক্তপতাকা উত্তোলন ও শহিদ বেদিতে মাল্যদান করার মধ্য দিয়ে। নেতৃবৃন্দ মে দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং যেভাবে শাসক শ্রেণি মানুষের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করেছে আন্দোলনের মাধ্যমেই এর থেকে পরিত্রাণ পেতে হবে বলে বার্তা পাঠান।

জীবন বীমা কর্পোরেশন ও ব্যাঙ্কসহ লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে ও অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে আরএসপি ও শ্রমিক সংগঠন ইউ টি ইউ সি'র উদ্যোগে কৃষ্ণনগর, রাণাঘাট ও কল্যাণী লোকালে বিক্ষোভ সভার আয়োজন করা হয়।

গত ১৭ মে রাণাঘাটে, ১৮ মে কৃষ্ণনগর ও ২৪ মে কল্যাণীতে শ্রমিক সংগঠন ইউ টি ইউ সি ব্যানার ও রক্তপতাকা সহযোগে মিছিল করে জীবন বীমা কর্পোরেশন অফিসে জমায়েত হয়ে বিক্ষোভ সমাবেশ করে।

সভায় বক্তব্য রাখেন আর এস পি নদীয়া জেলা সম্পাদক কম. শঙ্কর সরকার, ইউ টি ইউ সি নদীয়া জেলা কমিটির সম্পাদক ও আরএসপি জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য কম. সুবীর ভৌমিক, কম. ত্রিদিবেশ ভট্টাচার্য, কম. সমীর দাস, কম. বিশ্বনাথ সাহা প্রমুখ।

উক্ত সমাবেশ সমূহে নেতৃবৃন্দ জীবনদায়ী ওষুধ সহ সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধি, দুর্নীতি, স্বজনপোষণ ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস অবিলম্বে বন্ধের দাবি জানান। রাষ্ট্রীয় সংস্থা বেসরকারিকরণের তীব্র বিরোধিতা করে জোটবদ্ধ হয়ে লড়াই আন্দোলনের আহ্বান জানান।

Vol. 68 Issue No. 52 শনিবার ২৮ মে, 8 জুন ২০২২ (যুগ্ম সংখ্যা) আট
RN No. 2710/57 Rupees Five [By Air Rs. 6.50]
Phone : 2229-4653; e-mail : kranti.press@yahoo.com

সত্যজিৎ রায়ের ছবি উচ্চবিত্তসুলভ মূল্যবোধের সীমা অতিক্রম করেছে

৫-এর পাতার পর

করে। রাজার ভান্ডারে রাশি রাশি হীরা-জহরত স্বর্ণমুদ্রা থাকলেও রাজার প্রহরীরা যে কি ভীষণ ক্ষুধার্ত তারও ছবি এঁকেছেন। সত্যজিৎ রায়ের গুপী গাইন বাঘা বাইন প্রকৃতই একটি যুদ্ধবিরোধী ছবি। বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে ক্ষুধা যুদ্ধ এবং ভায়োলেন্স বিরোধিতা। আবার আন্তর্জাতিকতার সুরে তালে তালে ঋদ্ধ হলেও দেশ মাটির সঙ্গে জীবনবোধে সম্পৃক্ত বাংলার কথা বারবার তাঁদের সঙ্গীতে উচ্চারিত হয়েছে। হীরক রাজার দেশ অবশ্যই দেশজুড়ে যেভাবে রাষ্ট্রশক্তির প্ররোচনায় মানুষের কথা বলার অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে এবং শিক্ষা-সংস্কৃতি সমস্ত ক্ষেত্রে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে সেই ছবিটি নগ্ন করার ক্ষেত্রে ভীষণই প্রাসঙ্গিক চলচ্চিত্র। শিক্ষার অবরোধ থেকে সমাজকে মুক্ত করার জন্য উদয়ন পণ্ডিতের সংগ্রাম গরিব কৃষক শ্রমিকের সংগ্রামের সঙ্গে এক সূত্রে বেঁধে দিয়েছেন সত্যজিত। শুধু তাই নয় মগজধোলাইয়ের যন্ত্রে নিষ্পেষিত মানুষ রাষ্ট্রশক্তি নিপীড়নে অসত্য বলতে অভ্যস্ত হয়। এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম প্রতিবাদ থেকে প্রতিরোধে উত্তীর্ণ হয় দড়ি ধরে টান মেরে অত্যাচারী রাজা তাঁর জাদুকর এবং প্রশাসনের ভাবমূর্তি চুরমার করে দেশের সাধারণ মানুষ। এ যেন গ্রামশির তত্ত্বের নিপীড়ন এবং প্রচার মাধ্যমের সহায়তায় সম্মতি সৃষ্টির প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রাষ্ট্রশক্তির হেজিমনি সৃষ্টির বিরুদ্ধে নিপীড়িত মানুষের বিকল্প হেজিমনির এবং সংগ্রামের ইতিহাস। শুধুমাত্র হীরক রাজার দেশের শেষদৃশ্যে অত্যাচারী রাজা ও যখন এসে তাঁরি সৃষ্ট দানবীয় ভাবমূর্তি ভেঙে ফেলার জন্য রথের রশির মতো দেশে সাধারণ মানুষের সঙ্গে হাত লাগান তখনই যেন সত্যজিৎ সমসাময়িক এবং আগামী প্রজন্মের কাছে কিছু প্রশ্ন রেখে যান। এখানে কি অত্যাচারী রাজার হৃদয় পরিবর্তন ঘটেছিল? মার্ক্সের এলিয়েনেশনের ব্যাখ্যা অনুসারে পুঁজিবাদী সমাজে প্রতিটি শোষিত মানুষের মতো শোষক ব্যক্তিরও মনোজগতের চূড়ান্ত এলিয়েনেশন ঘটে, তারই একটি ব্যাখ্যা রাখতে চেয়েছেন। শ্রেণিমুক্ত সমাজ না গড়ে উঠলে মানসিক বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটে না। মহান শিল্পী কি এই দিকেই ইঙ্গিত দিয়েছেন। প্রশ্ন থেকে যায়। এই অতৃপ্তিই মহৎ শিল্পীর সৃজনশীলতার বৈশিষ্ট্য।

পানিহাটিতে আর এস পি বামফ্রন্টের কর্মসূচি

বামফ্রন্ট ও সহযোগী বামপন্থী দলসমূহের ২৫ থেকে ৩১ মে ব্যাপী গণআন্দোলনের কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে পানিহাটি আরএসপি লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে মূল্যবৃদ্ধি, বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে নিয়োগে দুর্নীতি, বেকারত্বের বিরুদ্ধে আগরপাড়া স্টেশন বটতলা বাজারে ও দক্ষিণ সুভাষনগর অঞ্চলে প্রায় বহুসংখ্যক হাতে লেখা পোস্টার মারা হয়। ২৮ মে বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে ঘোলা থেকে বি টি রোড পর্যন্ত বর্ণাঢ্য মিছিল সংগঠিত হয়। ২৯ মে রবিবার সকালে উয়ুমপুর বটতলা বাজারে আরএসপি লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করা হয়। ৩০ মে আগরপাড়া স্টেশনের সংলগ্ন সেনবাজারে আরএসপি'র উদ্যোগে বামফ্রন্টের নামে পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সভাপতি কম. দিলীপ দে, সিপিআই থেকে কম. গৌতম বিশ্বাস, ফরওয়ার্ড ব্লক থেকে কম. স্বপন দাস, সিপিএম থেকে কম. দুলাল চক্রবর্তী, কম. অনির্বাণ ভট্টাচার্য, কম. শুভব্রত চক্রবর্তী, আরএসপি'র থেকে কম. শঙ্কর ভট্টাচার্য, কম. প্রসেনজিৎ দাস, কম. সায়ন্তন চক্রবর্তী প্রমুখ বামপন্থী নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

এ বছর বাংলা আকাদেমির প্রবর্তিত বিশেষ সাহিত্য পুরস্কার

অবাক হওয়ার বিষয় না আদৌ, বাংলায় এখন তিনিই খেলোয়াড়, তিনিই দর্শক এবং তিনিই রেফারী। খাতা পেন্সিলকে ভালবেসে যে কোনো কাজের মধ্যে 'স্যাটাস্যাট' লিখে ফেলতে অভ্যস্ত মুখ্যমন্ত্রীকে বাংলা আকাদেমির প্রথম প্রবর্তিত বিশেষ সাহিত্য পুরস্কার দেওয়া হল। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিরলস ভাবে কাজ করেও, পশ্চিমবাংলার মতো সমস্যাসংকুল রাজ্যে তৃতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর আসন অলঙ্কৃত করেও তাঁর অক্লান্ত সাহিত্যসেবায় ঘাটতি পড়েনি। স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলা আকাদেমির নামাঙ্কিত এই বিশেষ পুরস্কারটি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পেলেন। ঘটনাচক্রে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং রাজ্যের মন্ত্রীও। সংবাদ মাধ্যমের একাংশকে বলতে শোনা গিয়েছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পুরস্কার দিলেন স্বয়ং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা আকাদেমি কর্তৃপক্ষ অবশ্য জানাননি কারা কবে কোন স্তরে সিদ্ধান্ত নিয়ে এই পুরস্কারটি পরিকল্পনা করলেন? কোন সাহিত্যিক এই পুরস্কারের জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে নির্বাচন করলেন? অবশ্য এই কমিটিতে অনেক নামী সাহিত্যসেবী রয়েছেন।

খানাকুলে রামমোহন রায় স্মরণে নিখিল বঙ্গ মহিলা সংঘের আলোচনাসভা

বেড়ে চলেছে আর্থিক সঙ্কট। মাইক্রোফিন্যান্স কোম্পানিগুলির ঋণের জালে জড়াচ্ছেন মহিলারা। আর্থ-সামাজিক মুক্তির পথ খোঁজার মধ্য দিয়েই রামমোহন রায়কে স্মরণ করলেন নিখিল বঙ্গ মহিলা সংঘের কর্মীরা।

গত ৩১ মে রামমোহন রায়ের ২৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সংগঠনের হুগলি জেলা কমিটির উদ্যোগে তাঁর জন্মস্থান খানাকুলে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। নারী মুক্তি আন্দোলনে রামমোহন রায়ের অবদান ও প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনা সভায় রাজ্য সম্পাদিকা সর্বানী ভট্টাচার্য সহ রাজ্য নেত্রীবৃন্দের সামনে উঠে এল শ্রমজীবী মহিলাদের জীবন সংগ্রামের করুণ চিত্র। ফসলের দাম না থাকায় কৃষি অর্থনীতি বিপর্যস্ত। বাড়ছে দেনা। মাইক্রোফিন্যান্স কোম্পানিগুলি সেই সুযোগে ঋণের জাল পেতেছে। হয়রানি, হুমকিতে আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন মহিলারা। খানাকুলের আত্মঘাতী কৃষকের স্ত্রী শোনালেন হয়রানির কথা। সাত মাস অতিক্রান্ত। এখনও স্বামীর জীবন বীমার অর্থ দেয় নি মাইক্রোফিন্যান্স কোম্পানি। মহিলা বিড়ি শ্রমিক বিড়ি বানানোর সঠিক মজুরি পাচ্ছেন না। মহিলা তাঁত শ্রমিকের আয় বন্ধের মুখে। সন্তানদের লেখাপড়ার খরচ যোগানো অনিশ্চিত। একশো দিনের কাজ মিলছে না। মাসের পর মাস মজুরি বকেয়া রয়েছে। নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা বলার পাশাপাশি মহিলারা তুলে ধরলেন লড়াইয়ের কথা। নিখিল বঙ্গ মহিলা সংঘের প্রতিরোধের মুখে এতাঞ্চল থেকে পিছু হটেছে মাইক্রোনিফিন্যান্স কোম্পানির এজেন্ট। একশো দিনের কাজের দাবিতে পঞ্চায়েত প্রধান বা সদস্যদের ঘেরাও করে জবাবদিহি চেয়েছেন তাঁরা। মহিলা সংঘের এই লড়াইয়ের পাশে থেকেছেন আর এস পি নেতৃত্ব।

কর্মীদের আলোচনাকে কেন্দ্র করেই আন্দোলনের আহ্বান জানালেন নিখিল বঙ্গ মহিলা সংঘের রাজ্য নেতৃত্ব। কম. সর্বানী ভট্টাচার্য সামাজিক আন্দোলনে রামমোহন রায়ের অবদানকে স্মরণ করে বলেন যে, আজ নারীদের অবস্থা অনেকখানি উন্নত হলেও অনেক পথ চলতে হবে। নারীরা এখনও সামাজিক ও আর্থিক বৈষম্যের শিকার। আজ মৌলবাদ নারীদের অন্ধকার যুগে ফিরিয়ে নিতে চাইছে। ধর্মীয় মৌলবাদ ও ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে রামমোহনের ভূমিকা স্মরণ করে তিনি বলেন যে, নারী নির্যাতন বাড়ছে। কেন্দ্র ও রাজ্য দুই সরকারেরই ভূমিকার তিনি তীব্র সমালোচনা করেন। রাজ্য নেত্রী কম. সুস্মিতা রায় ও কম. রমা দে বলেন যে, মহিলাদের আর্থ-সামাজিক মুক্তির লড়াইয়ে আজও রামমোহন পথ প্রদর্শক। হুগলি জেলা সম্পাদিকা কম. চম্পা বসাক সভায় আগত মহিলাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। জেলা সহ সম্পাদিকা কম. রুষা মজুমদার রামমোহন রায়ের জীবন কাহিনী আলোচনা করে বলেন যে, খানাকুলের বাসিন্দারা তাঁর অবদানের জন্য গর্বিত। আর এস পি হুগলি জেলা সম্পাদক কম. মৃন্ময় সেনগুপ্ত ঊনবিংশ শতকের প্রগতিশীল সামাজিক আন্দোলনের পথিকৃৎ রামমোহন রায়কে স্মরণ করে বলেন যে, নারীদের সামাজিক মুক্তি ও নারী শিক্ষার প্রসার ছিল এই আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। আজও সেই বৈষম্য রয়েছে। শ্রমজীবী মহিলারা আর্থ-সামাজিক বঞ্চনার শিকার। খানাকুলের বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরে তিনি সংগঠনের কর্মীদের প্রতিবাদী ভূমিকার কথা তুলে ধরেন। দলের রাজ্য কমিটির সদস্য কম. কিশোর সিং মহিলাদের প্রতি বঞ্চনার বিষয়গুলি তুলে ধরেন। সভাপতিত্ব করেন জেলা সভানেত্রী কম. বিজয়া দে। উপস্থিত ছিলেন আর এস পি জেলা কমিটির সদস্য কম বিপ্লব মজুমদার, লোকাল কমিটির নেতা কম. সুনীল চক্রবর্তী, কম. অরুণ কাঁড়ার, কম. বংশী মাইতি প্রমুখ।

গোসাবায় আর ওয়াই এফের সভায় তৃণমূলী হামলা

গত ২২ মে আর ওয়াই এফের কোস্টাল লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে গোসাবার লাক্সবাগানে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দাবিতে একটি পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

বেআইনিভাবে সুন্দরবনের নদী চর দখলের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন দপ্তরে কর্মী নিয়োগে দুর্নীতির বিরুদ্ধে, অবিলম্বে পি এস সি স্টাফ সিলেকশন এবং শিক্ষা দপ্তরে স্বচ্ছতার সঙ্গে নিয়োগের দাবিতে প্রতিবাদী পথ সভা অনুষ্ঠিত হয়। দেশ ও রাজ্যজুড়ে সমস্ত জিনিসের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, ইত্যাদির প্রতিবাদে সেই সভায় সোচ্চার হয়েছিলেন গোসাবার প্রাক্তন বিধায়ক কম. চিত্তরঞ্জন মণ্ডল, আর ওয়াই এফের সর্বভারতীয় সহ সাধারণ সম্পাদক কম. আদিত্য জোতদার, কম. সুবোধ মণ্ডল, অর এস পি'র কোস্টাল লোকাল সম্পাদক কম. মনোরঞ্জন ঘোড়ুই, আর ওয়াই এফের গোসাবা কোস্টাল লোকালের সম্পাদক কম. নিখিল মণ্ডল, ও সভাপতি কম. বিধান মণ্ডল প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। কম. আদিত্য যখন বক্তব্য রাখছেন তখন স্থানীয় তৃণমূল দুর্বৃত্তরা তাকে ধমক দিয়ে বক্তব্য বন্ধ রাখতে হুকুম দেয়। এমনকি, তার মাইক কেড়ে নিতে উদ্যত হয়। সভায় উপস্থিত আর ওয়াই এফের কর্মী ও সমর্থক সহ উপস্থিত শ্রোতারা এর প্রতিবাদে রুখে দাঁড়ান। প্রায় দেড় শতাধিক মানুষ সম্মিলিতভাবে এই গুন্ডাবাহিনীর আক্রমণের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করেন।

আর ওয়াই এফ এবং স্থানীয় আর এস পি কমরেডরা তাঁদের সমর্থনে স্থানীয় সাধারণ জনগণকে এই প্রতিবাদী ভূমিকা নেওয়ার জন্য সংগ্রামী অভিনন্দন জানান।

রেলের টিকিটে প্রবীণদের ছাড়ের দাবিতে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি ইউ টি ইউ সি'র

করোনা পর্ব থেকেই ট্রেনের টিকিটে মোদি সরকার প্রবীণ নাগরিকদের ছাড় বন্ধ করে দিয়েছে। সেই ব্যবস্থা পুনরায় চালু করার দাবিতে বৃহত্তর গণআন্দোলনের পথে পদক্ষেপ করতে চলেছে সর্বভারতীয় শ্রমিক সংগঠনগুলি। রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবকে চিঠি পাঠিয়ে শ্রমিক সংগঠন ইউ টি ইউ সি জানিয়েছে প্রবল সমস্যায় পড়েছেন প্রবীণ নাগরিকরা। অবিলম্বে টিকিটের দামের ছাড় ফেরানো হোক। দ্রুত পদক্ষেপ না নেওয়া হলে বৃহত্তর আন্দোলনেরও হুঁশিয়ারি দিয়েছে শ্রমিক সংগঠনগুলি। ফলে প্রবল চাপে পড়ে গিয়েছে রেলবোর্ড। বুধবার ইউ টি ইউ সি'র সাধারণ সম্পাদক অশোক ঘোষ বলেন, ' প্রবীণ নাগরিকদের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের যে দায় রয়েছে তা তারা কোনোমতেই অস্বীকার করতে পারে না। অথচ দীর্ঘদিন ধরে প্রবীণ নাগরিকদের জন্য টিকিটের ছাড় বন্ধ রেখে তাদের প্রচণ্ড অসুবিধার মধ্যে ফেলছে রেল। অবিলম্বে পুরানো ব্যবস্থা চালু না হলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটবো।'

বিষয়টি নিয়ে যাতে ঐক্যবদ্ধভাবে সমস্ত সংগ্রামী সর্বভারতীয় শ্রমিক সংগঠনগুলির সঙ্গে লড়াই করা যায় সেই উদ্দেশ্যে অবিলম্বে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে। এমনকি ভারতীয় মজদুর সংঘের সঙ্গেও প্রয়োজনে যোগাযোগ করা হবে।

Printed and published by Manoj Bhattacharya from Kranti Press, 37 Ripon Street, Kolkata-700 016, Editor : Manoj Bhattacharya of behalf of RSP (Website : www.ganavarta.com)
Price Rs. 5/-